শ্রাবণমেঘের দিন

হুমায়ূন আহমেদ

শ্রাবণমেঘের দিন

হুমায়ূন আহমেদ

সময় প্রকাশন

শ্রাবণমেঘের দিন
হুমায়ূন আহমেদ

৬ষ্ঠ মুদ্রণ : জুলাই ১৯৯৬
৫ম মুদ্রণ : জুলাই ১৯৯৫
৪র্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
৩য় মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৯৫
২য় মুদ্রণ : ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৪
প্রথম প্রকাশ : ৩০ নভেম্বর ১৯৯৪
(১ম ও ২য় মুদ্রণ দ্বিগুণ ছাপা)

১১শ মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১২
১০তম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৯
৯ম মুদ্রণ : জুন ২০০৫
৮ম মুদ্রণ : জুন ২০০০
৭ম মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৯৮

সময়
সময় ০৮৬

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
নৃশা কম্পিউটার্স, আজিমপুর, ঢাকা

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স, শিংটোলা, ঢাকা

মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা মাত্র

SHRABONMEGHER DIN a Novel by Humayun Ahmed. First Published : 30th November 1994, 11th Print January 2012 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka.

Website : www.somoy.com Email : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 175.00 Only

ISBN 984-458-086-2 Code: 086

উৎসর্গ

আমার স্থপতি বন্ধু ফজলুল করিম, প্রিয়জনেষু

কাউকেই আমার দীর্ঘদিন ভাল লাগে না। আমি জানি এক সময়
এই চমৎকার মানুষটির সঙ্গও আমার অসহ্য বোধ হবে ; তার আগেই
বই উৎসর্গ করে আমি আমার বর্তমানের ভালবাসা জানিয়ে দিলাম।

"দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক।"

১

নীতু বলল, আপা, আমার ভয় ভয় লাগছে।

শাহানার চোখে চশমা, কোলে মোটা একটি ইংরেজি বই — The Psychopathic Mind. দারুণ মজার বই। সে বইয়ের পাতা উল্টাল। নীতুর দিকে একবারও না তাকিয়ে বলল, ভয় লাগার মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

গা জ্বলে যাবার মত কথা। কি রকম হেড মিসট্রেস টাইপ ভাষা — "ভয় লাগার মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।" অথচ পরিস্থিতি যথেষ্টই খারাপ। তারা দু'জন একা একা যাচ্ছে। দু'জন কখনো একা হয় না, সঙ্গে পুরুষমানুষ কেউ নেই বলে নীতুর কাছে একা একা লাগছে। ঠাকরোকোনা স্টেশনে বিকেলের মধ্যে তাদের পৌঁছার কথা। এখন সন্ধ্যা, ট্রেন থেমে আছে। ঠাকরোকোনা স্টেশন আরো তিন স্টপেজ পরে। যে ভাবে ট্রেন এগুচ্ছে, নীতুর ধারণা, পৌঁছতে পৌঁছতে রাত-দুপুর হয়ে যাবে। তখন তারা কি করবে? স্টেশনে বসে ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করবে? মেয়েদের বসার কোন জায়গা আছে কি? যদি না থাকে তারা কোথায় বসবে?

নীতু বলল, আপা, তুমি বইটা বন্ধ কর তো।

শাহানা বই বন্ধ করল। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলল। শাহানার বয়স চব্বিশ। তার গায়ে সাধারণ একটা সূতির শাড়ি। কোন সাজসজ্জা নেই অথচ কি সুন্দর তাকে লাগছে! নীতু কিছুক্ষণের জন্যে ভয় পাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে বলল, আপা, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

'সুন্দর মানুষকে সুন্দর লাগবে এটা তো নতুন কিছু না। তোকে তেমন সুন্দর লাগছে না। ভয়ে চোখ-মুখ বসে গেছে। এত কিসের ভয়?'

'স্টেশন থেকে আমরা যাব কি ভাবে?'

'অন্যরা যে ভাবে যায় সেই ভাবে যাব। রিকশা পাওয়া গেলে রিকশায়, গরুর

গাড়ি পাওয়া গেলে গরুর গাড়ি, নৌকায় যাবার ব্যবস্থা থাকলে নৌকায়। কিছু না পাওয়া গেলে হন্টন।'

'হেঁটে এত রাস্তা যেতে পারবে?'

'এত রাস্তা তুই কোথায় দেখলি? মাত্র সাত মাইল। এলিভেন পয়েন্ট টু কিলোমিটার। তিন ঘণ্টার মত লাগবে।'

নীতুদের কামরায় লোকজন বেশি নেই। তাদের বেঞ্চটা পুরো খালি। একজন এসে বসেছিল, কিছুক্ষণ পর সেও সামনের বেঞ্চে চলে গেছে। নীতু এই ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করছে — কোন্ স্টেশনে ক'জন উঠল, ক'জন নামল। সামনের বেঞ্চে এখন সাতজন মানুষ বসে আছে। সবাই পুরুষ। কোন মেয়ে এখন পর্যন্ত তাদের কামরায় উঠেনি। যারা এই কামরায় উঠেছে তারা সবাই বয়স্ক বুড়ো ধরনের গ্রামের মানুষ। শুধু একটি ন'-দশ বছরের ছেলে আছে। ছেলেটা বোধহয় অসুস্থ। এই গরমেও তাকে কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। ছেলেটির পাশে যে বুড়ো মানুষটি বসে আছে তার কোলে ঝকঝকে পেতলের একটা বদনা। সে বদনার নলটা কিছুক্ষণ পর পর ছেলেটার মুখে ধরছে। ছেলেটা চুক চুক করে কি যেন খাচ্ছে। কি আছে বদনায় — পানি? বদনায় করে কেউ পানি খায়?

নীতু ফিস ফিস করে বলল, আপা, বদনায় করে ঐ ছেলেটা কি খাচ্ছে?

শাহানা বলল, আমার তো জানার কথা না নীতু।

'একটু জিজ্ঞেস করে দেখো না।'

'তোর জানতে ইচ্ছা করছে, তুই জিজ্ঞেস কর। আমাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করাবি কেন?'

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। সন্ধ্যা মিলিয়েছে। আকাশ মেঘে মেঘে কালো বলে দিনের আলো নেই। এখন কামরার ভেতরটা পুরোপুরি অন্ধকার। নীতুর ব্যাগে একটা পেনসিল টর্চ আছে। টর্চটা সে বের করবে কি-না বুঝতে পারছে না। নীতু বলল, ট্রেনের বাতি জ্বলছে না কেন আপা?

শাহানা কিছু বলার আগেই সামনের বেঞ্চ থেকে একজন বলল, এই লাইনের ট্রেইনে রাইতে বাত্তি জ্বলে না।

নীতু বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

'গরমেন্টের ইচ্ছা। করনের কিছু নাই।'

নীতু বলল, গভর্নমেন্ট শুধু শুধু বাতি বন্ধ করে রাখবে কেন?

শাহানা মনে মনে হাসল। নীতু গল্প করার মানুষ পেয়ে গেছে। এখন বক বক করে কথা বলে যাবে। এক মুহূর্তের জন্যেও থামবে না। শাহানা জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিয়েছে। বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। পত পত শব্দ হচ্ছে। ট্রেনের

ভেতরটা অন্ধকার, বাইরে দিন–শেষের আলো। তার অদ্ভুত লাগছে। ট্রেনযাত্রীর সঙ্গে নীতুর কথাবার্তা শুনতেও ভাল লাগছে। কি বকবকানিই না এই মেয়ে শিখেছে!

'আফনেরা দুইজনে যান কই?'

'আমরা যাচ্ছি সুখানপুকুর। আমাদের দাদার বাড়ি। ঠাকরোকোনা স্টেশনে নামব। সেখান থেকে রিকশায়, কিংবা নৌকায় যাব। কিছু না পেলে হেঁটে যাব। ঠাকরোকোনা কখন পৌঁছব বলতে পারেন?'

'এক–দুই ঘন্টা লাগবে।'

ট্রেনের গতি বাড়ছে। শাহানার চুল বাঁধা। তার ইচ্ছা করছে চুল ছেড়ে দিতে। ট্রেনের জানালায় মাথা বের করা থাকবে, বাতাসে চুল উড়তে থাকবে পতাকার মত। পৃথিবীতে সবচে সুন্দর পতাকা হল তরুণীর মাথার উড়ন্ত চুল। শাহানা কি খোপা খুলে ফেলবে? নীতু ডাকল, আপা!

শাহানা মুখ না ফিরিয়েই বলল, কি?

'এই লাইনে ট্রেনে প্রায়ই ডাকাতি হয়।'

'কে বলল? ঐ বুড়ো?'

'হুঁ। তারা তো এই ট্রেনেই যাতায়াত করে। সব জানে। ডাকাতরা আউট স্টেশনে ট্রেন থামায় তারপর ডাকাতি করে।'

'করুক। ডাকাতরা তো ডাকাতি করবেই। ডাকাতি হচ্ছে তাদের পেশা।'

'একটা কথা বললেই তুমি তার অন্য অর্থ কর। যদি ডাকাত পড়ে আমরা কি করব?'

'আগে ডাকাত পড়ুক তারপর দেখা যাবে। আউট স্টেশন আসতে দেরি আছে। তুই এত অস্থির হোস না তো নীতু, যা হবার হবে। আগে আগে এত চিন্তা করে লাভ কি? জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখ কি সুন্দর লাগছে।'

নীতু নিতান্ত অনিচ্ছায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তার কাছে মোটেই সুন্দর লাগছে না, বরং ভয় আরও বেশি লাগছে। ঘন কালো আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দমকা বাতাস দিচ্ছে। বাতাসের ঝাপ্টা চোখে–মুখে লাগছে। নীতু ফিস ফিস করে বলল, পেতলের বদনায় ছেলেটাকে কি খাওয়াচ্ছে জান আপা?

'না।'

'তালতলার পীর সাহেবের পড়া পানি। এই পড়া পানি পেতলের পাত্রে রাখতে হয়। না রাখলে পানির গুণ নষ্ট হয়ে যায়। ছেলেটার কামেলা রোগ হয়েছে। কামেলা রোগ কি আপা?'

'কামেলা হল জণ্ডিস।'

'পড়া পানি পেতলের পাত্রে রাখলে গুণ নষ্ট হয় না কেন আপা?'

'আমি জানি না। তালতলার পীর সাহেব হয়ত জানেন।'

'আপা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে . . . ।'

'হুঁ।'

'প্রচণ্ড ঝড় হবে, তাই না আপা ?'

'ঝড় হবে কি–না বুঝতে পারছি না, তবে বৃষ্টি হবে।'

'আমার কাছে মনে হচ্ছে ঝড় হবে। আচ্ছা আপা, ঝড়ের সময় ট্রেন কি চলতে থাকে, না এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে ?'

'জানি না।'

'আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে।'

'ট্রেন থেকে আমরা যখন নামব তখন ট্রেনের ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস। তারই জানার কথা। জিজ্ঞেস করবি ?'

'তুমি আমার হয়ে জিজ্ঞেস করে দেবে ?'

'আমি করব না। তুই করবি। তোর কৌতূহল হয়েছে, তুই মেটাবি।'

'তোমার কোন কৌতূহল নেই ?'

শাহানা সহজ গলায় বলল, ঝড়ের সময় ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে, না চলতে থাকে এটা জানার কোন কৌতূহল নেই। পৃথিবীতে জানার অনেক বিষয় আছে।

ট্রেনের কামরায় হারিকেন জ্বলছে। অসুস্থ ছেলেটির বাবা হারিকেন ধরিয়েছে। এরা রাতে ট্রেনে চাপলে হারিকেন সঙ্গে নিয়েই উঠে। হারিকেনটার কাঁচ ভাঙা। লাল শিখা দপদপ করছে। যে কোন মুহূর্তে নিভে যাবে। নীতু গভীর আগ্রহ নিয়ে হারিকেনের শিখার দিকে তাকিয়ে আছে। তার হাতে পেনসিল টর্চ। টর্চটা কাজ করছে না। বাইরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। হালকা বর্ষণ। শাহানা মাথা বের করে ভিজছে।

ঠাকরোকোনা স্টেশন আসতে দেরি নেই। সামনের স্টেশনই ঠাকরোকোনা। ট্রেনের গতি এখনো কমতে শুরু করেনি। আউট স্টেশনের সিগন্যালের পর কমতে থাকবে। শাহানা হাতের ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল। রেডিয়াম ডায়াল থাকা সত্ত্বেও ঘড়ির লেখা পড়া যাচ্ছে না। তবে রাত ন'টার মত বাজে। চার ঘণ্টা লেট। রাত ন'টা ঢাকা শহরে এমন কিছু রাত না — কিন্তু ঢাকার বাইরে গভীর রাত। শাহানা চিন্তিত বোধ করছে। এতক্ষণ সে সাহসী তরুণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে — ট্রেন থামার পর সত্যিকার অর্থেই সাহসী তরুণী হতে হবে। সুখানপুকুরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে — দু'টি মেয়ে ইচ্ছা করলে নিজেরা নিজেরা ঘুরে বেড়াতে পারে। বডিগার্ডের মত একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে না থাকলেও হয়।

ভরা বৃষ্টির মধ্যে তারা স্টেশনে নামল। তাদের নামিয়ে দিয়েই ট্রেন হুস করে চলে গেল। নীতু বলল, আপা, আমরা দু'জনই শুধু নেমেছি — আর কেউ না। এটা স্টেশন তো? নাকি পথে কোথাও নেমে পড়েছি?

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে বাতির আভাস দেখা যায়। ঐটাই কি স্টেশন মাস্টারের ঘর? শাহানা আলোর দিকে এগুচ্ছে, নীতু আসছে তার পেছনে পেছনে। দু'জনের হাতে দু'টা স্যুটকেস। নীতু রাজ্যের গল্পের বই তার স্যুটকেসে ভরেছে বলে অসম্ভব ভারী। তার রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। কষ্টের সঙ্গে আতংকও যুক্ত হয়েছে — তার এখনো ধারণা তারা স্টেশনে নামেনি। কোন কারণে ট্রেন স্টেশনের আগেই থেমেছিল। তারা নেমে পড়েছে। নয়তো একটা স্টেশনে মাত্র দু'জন যাত্রী নামবে কেন?

'আপা!'

'হুঁ।'

'ভিজে গেছি তো আপা।'

'বৃষ্টির ভেতর হাঁটলে তো ভিজতে হবেই। তুই ভরা বৃষ্টিতে হাঁটবি আর গা থাকবে শুকনা খটখটে তা হয় না।'

'আমরা এখন কি করব?'

প্রথমেই স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কথা বলব . . . ।

'তারপর?'

'তারপরেরটা তারপর।'

নীতু আতংকিত গলায় বলল, আপা, আমি গোবরে পা দিয়ে ফেলেছি।

'ভাল করেছিস।'

শাহানা হাসছে। নীতুর প্রায় কান্না পেয়ে গেল। সে লক্ষ্য করছে, আজেবাজে ধরনের দুর্ঘটনা সব সময় তার কপালেই ঘটে। গোবরে শাহানার পাও পড়তে পারত। তা না পড়ে তার পা পড়ল কেন? সে কি দোষ করেছে?

ছোট্ট জানালার ফাঁক দিয়ে স্টেশন মাস্টার মনসুর আলি তাকিয়ে আছেন। তাঁর শরীর ভাল না। জ্বরে কাহিল হয়ে আছেন। এতক্ষণ চেয়ারে বসেই ঘুমুচ্ছিলেন। ট্রেন আসার শব্দে জেগে উঠেছেন। তাঁর চোখ-মুখ ভাবলেশহীন হলেও তিনি যে আকাশ থেকে পড়ছেন তা বোঝা যাচ্ছে। রাত-দুপুরে ফুটফুটে দু'টি মেয়ে স্টেশনের জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে, এর মানে কি? একজনের বয়স বার-তের। অন্যজনের বয়স ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। উনিশ-কুড়ি হতে পারে, আবার চব্বিশ-পঁচিশও হতে পারে। দু'টি

মেয়েই পরীর মত। সঙ্গে কোন পুরুষমানুষ দেখা যাচ্ছে না। এরা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসেনি তো? বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে পুলিশে খবর দিতে হয়। বাড়তি ঝামেলা। ঝড়-বৃষ্টির রাত — কোথায় বাড়িতে গিয়ে আরাম করে ঘুমুবেন তা না, থানা পুলিশ ছুটাছুটি কর।

নীতু স্টেশন মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাদের স্টেশনে টিউবওয়েল আছে? আমি পা ধোব। ভুলে আমি গোবরে পা দিয়ে ফেলেছি। স্টেশন ভর্তি এত গোবর কেন?

স্টেশন মাস্টার মনসুর আলির গলার স্বর এম্নিতেই ভাঙা। সেই স্বর আরো ভেঙে গেল। তিনি গোবর সমস্যার ধার দিয়ে গেলেন না। আগে মূল সমস্যাটা ধরতে হবে। তারপর গোবর। তিনি নীতুকে এড়িয়ে শাহানার দিকে তাকিয়ে বললেন — কোথায় যাওয়া হবে?

আপনি-তুমির সমস্যা এড়িয়ে ভাববাচ্যে কথা বলা। তাঁর রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে গেছে। এই বয়সে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের আপনি বলতে ইচ্ছা করে না। আবার চট করে তুমিও বলা যায় না।

শাহানা বলল, আমরা সুখানপুকুর যাব। আপনি কি দয়া করে আমার ছোটবোনের পা ধোয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন? ওর শুচিবায়ুর মত আছে।

'সুখানপুকুর কার কাছে যাওয়া হবে?'

শাহানা হাসি হাসি মুখে বলল, সুখানপুকুরে আমাদের দাদার বাড়ি। দাদাকে দেখতে যাব।

'আপনার দাদার নাম কি ইরতাজুদ্দিন?'

'জ্বি।'

'ও, আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা আসুন, ভেতরে এসে বসুন। আচ্ছা দাঁড়ান, তার আগে পা ধোয়ার ব্যবস্থা করি।'

মনসুর আলি নিজের চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। নীতু ফিস ফিস করে বলল — বিখ্যাত দাদা থাকার অনেক সুবিধা, তাই না আপা?

'হুঁ।'

'এখন আর আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।'

'মনে হয় না।'

'এই ভরসাতেই তুমি এত নিশ্চিত হয়েছিলে?'

শাহানা হাসল।

মনসুর আলি সাহেবের মুখে কোন হাসি নেই। রাত বারটা একুশ মিনিটে নাইন আপ পার করে দেবার পর ভোর ন'টা পর্যন্ত তাঁর নিশ্চিন্ত থাকার কথা ছিল। সুন্দর

বৃষ্টি নেমেছে। আরামের ঘুম ঘুমানো যাবে। এখন মনে হচ্ছে সব এলোমেলো হয়ে গেছে। পয়েন্টসম্যান বদরুলকে খুঁজে বের করতে হবে। কোথাও নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। মেয়ে দু'টির সঙ্গে পুরুষমানুষ কেউ আছে কি–না বোঝা যাচ্ছে না। আছে নিশ্চয়ই। ভং ধরে বৃষ্টিতে ভিজছে। সামান্য স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কথা বললে তাদের অপমান হবে। এদের চা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। বদরুলকে পাঠিয়ে চা আনাতে হবে। এরা এইসব চা খাবে না। এক চুমুক দিয়ে রেখে দেবে। তারপরও দিতে হবে। সুখানপুকুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কাঁচা রাস্তা। হাঁটু পর্যন্ত ডেবে যাবে কাদায়। গরুর গাড়ি পাওয়া গেলে গাড়িতে উঠিয়ে দেয়া যাবে। এত রাতে পাওয়া যাবে কি–না কে জানে।

মনসুর আলি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখলেন মেয়ে দু'টির সঙ্গে পুরুষমানুষ কেউ আসেনি। এরা একাই এসেছে। সারা স্টেশন খুঁজে বদরুলকে পেলেন না। হারামজাদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাজিলদের একজন। বাড়িতে গিয়ে ঘুমুচ্ছে। চায়ের খোঁজে তাঁকেই যেতে হবে। তাঁর হঠাৎ মনে হল, তিনি সঙ্গে ছাতা আনেননি। এম্নিতেই গায়ে জ্বর। তার উপর বৃষ্টিতে ভিজলে নির্ঘাৎ বুকে ঠাণ্ডা বসে যাবে। জ্বর আরো বাড়বে, ধরবে নিওমোনিয়া।

নীতু বলল, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

মনসুর আলি বললেন, না না, ব্যস্ত হচ্ছি না তো। ব্যস্ত হবার কি আছে? আপনারা চা খাবেন?

নীতু বলল, পরে খাব। আগে পা ধোব। এখানে টিউবওয়েল আছে না?

'ও আচ্ছা হ্যাঁ — পা। অবশ্যই। অবশ্যই। টিউবওয়েল আছে। টিউবওয়েল থাকবে না কেন?'

বলেই মনসুর আলির মনে হল — টিউবওয়েল আছে ঠিকই, ওয়াসার নষ্ট হয়ে গেছে বলে পানি উঠে না। এখন এই মেয়েকে পুকুরে নিয়ে যেতে হবে। স্টেশনের কাছেই পুকুর — বেশি হাঁটতে হবে না। তবে ঘাট–নেই পুকুর। ঝুম করে এই মেয়ে পানিতে পড়ে গেলে ষোলকলা পূর্ণ হয়।

মনসুর আলি বিব্রত গলায় বললেন, টিউবওয়েলটা বোধহয় নষ্ট — আপনাকে কষ্ট করে একটু পুকুরে যেতে হবে।

'আমার কোন কষ্ট হবে না। চলুন। গা ঘিন ঘিন করছে। আর শুনুন, আমাকে তুমি করে বলুন। আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি।'

'মা, তুমি সাঁতার জান তো?'

নীতু বিস্মিত হয়ে বলল, পা ধোয়ার জন্যে সাঁতার জানতে হবে কেন?

'না, এম্নি বলছি।'

'আমি সাঁতার জানি না।'

'সাঁতার জানা ভাল। কখন দরকার হয় কিছু তো বলা যায় না।'

মনসুর আলির মনে হল তাঁর জ্বর বেড়েছে। কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মেয়ে দুটি বড়ই সুন্দর। তাঁর নিজের মেয়েও সুন্দর — শুধু দাঁত উঁচু বলে বিয়ে হচ্ছে না। আজকাল না-কি উঁচু দাঁত ঠিক করা যায়। নিশ্চয়ই বিস্তর টাকার দরকার হয়। মেয়েটার দাঁত ঠিক করলে এই মেয়ে দু'টির মতই সুন্দর হত।

শাহানা এবং নীতু টিকিট ঘরে বসে আছে। মনসুর আলি গেছেন তাদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে। চায়ের ব্যবস্থা করবেন, সুখানপুকুরে যাবার ব্যবস্থা করবেন। বদরুল হারামজাদাকে খুঁজে বের করবেন। হারামজাদাটাকে সবসময় পাওয়া যায় — শুধু কাজের সময় পাওয়া যায় না।

নীতুর এখন মজাই লাগছে। তার ভয় কেটে গেছে। স্টেশন মাস্টার সাহেব এখন আর তাদের কোন ঝামেলা হতে দেবেন না। টিকিট ঘরের দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে ভদ্রলোক যে পুরোপুরি উধাও হয়ে গেলেন এতে নীতু খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছে। এখন যদি কেউ এসে টিকিট চায় তাহলে তারা কি করবে? হঠাৎ ঘরে টক টক শব্দ হতে শুরু করল। নীতু বলল, শব্দ কিসের আপা?

শাহানা সহজ গলায় বলল, টেলিগ্রাফ এসেছে। মোর্স কোডে খবর দিচ্ছে।

'কি খবর?'

'ভালমত না শুনে বলতে পারব না। কোড এনালাইসিস করতে হবে।'

'কি ভাবে এনালাইসিস করবে?'

'টরে টক্কা হল A, টক্কা টরে টরে টরে হল B, টক্কা টরে টক্কা টরে হল C, D হল টক্কা টরে টরে . . .।'

'তুমি এত সব জানলে কি ভাবে?'

'বই পড়ে জেনেছি।'

'বই তো আমিও পড়ি, আমি তো কিছু জানি না . . .।'

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকিট ঘরের হারিকেন দপ দপ করতে লাগল। নিভি নিভি করেও শেষ পর্যন্ত নিভল না। হারিকেন নিজেকে সামলে নিল। আধো অন্ধকার ঘরে টেলিগ্রাফের টরে টক্কা শব্দ হচ্ছে। বাতাসে জানালা ভেদ করে বৃষ্টির ছাট আসছে।

'আপা।'

'হুঁ।'

নীতু থমথমে গলায় বলল, বাইরে একটু তাকিয়ে দেখবে আপা?'

'প্রয়োজন হলে দেখব। প্রয়োজন বোধ করছি না। বাইরে তাকিয়ে কিছুই দেখা যাবে না। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।'

'আমি একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি।'

'কি দেখতে পাচ্ছিস?'

'একটা লোক দেখতে পাচ্ছি আপা। দুষ্টলোক। লোকটা বিড়ি খাচ্ছে। আর তার গোঁফ আছে।'

'অন্ধকারে দেখছিস কি ভাবে?'

'ঐ দেখ বিড়ির আগুন জ্বলছে, নিভছে। মুখে নিয়ে যখন টানে তখন বিড়ির আলোয় তার ঠোঁট আর গোঁফ দেখা যায় — দেখতে পাচ্ছ?'

'হুঁ। বিড়ি না হয়ে সিগারেটও হতে পারে। বিড়ি যে বুঝলি কি করে?'

'অন্ধকারে সিগারেটের আগুন কেমন হয় আমি জানি — এটা সিগারেটের আগুন না। আপা, আমরা এখন কি করব?'

'আমরা বসে বসে একটা লোকের বিড়ি খাওয়া দেখব।'

'আর কিছু করব না?'

'উহুঁ।'

'আপা, লোকটা কিন্তু আমাদের দিকে আসছে।'

'আসুক।'

'লোকটার মতলব ভাল না আপা।'

'কি করে বুঝলি মতলব ভাল না?'

'হাঁটা দেখে বুঝছি। দেখ না কেমন থেমে থেমে আসছে। মতলব ভাল হলে থেমে থেমে আসত না।'

'আজকাল তুই ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাস বেশি পড়ছিস। ডিটেকটিভ বই বেশি পড়লে আশেপাশের সবাইকে চোর বা ডাকাত মনে হয়। ভূতের বই বেশি পড়লে প্রতিটি অন্ধকার কোণে একটা করে ভূত আছে বলে মনে হয়।'

'লোকটা আমাদের দেখতে পেয়েছে আপা।'

'স্টেশন ঘরে হারিকেনের আলো আছে। দেখতে না পাওয়ার কোন কারণ নেই।'

'দেখ আপা, লোকটা আগের বিড়ি ফেলে দিয়ে নতুন করে বিড়ি ধরিয়েছে। বলেছিলাম না — দুষ্টলোক।'

'দুষ্টলোক-টোক না, চেইন স্মোকার। এ বেশি দিন বাঁচবে না।'

'বাঁচবে না কেন?'

'চেইন স্মোকাররা বেশি দিন বাঁচে না। ওদের আর্টারিতে চর্বি জমে আর্টারি সরু হয়ে যায়। তারপর হয় হার্ট এ্যাটাক . . .। আর্টারি কি জানিস তো?'

'জানি। রক্তবাহী শিরা।'

ভয়ে নীতুর বুক কাঁপছে, কারণ লোকটার মুখ এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। টিকিট ঘরের ফুটো দিয়ে সে তাকাচ্ছে। লোকটার ঠোঁটে গোঁফ নেই। সে আসলে ভুল দেখেছে। বিশ্রী গোলাকার একটা মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে লম্বা চুল। লোকটা সর্দি-বসা গলায় বলল, মাস্টার সাহেব কই?

নীতু বলল, মাস্টার সাহেব কোথায় আমরা জানি না। আপনি কে?

'আপনারা কে?'

'আমরা কে তা দিয়ে আপনার কোন দরকার নেই।'

'যাবেন কোথায়?'

'তা দিয়েও আপনার দরকার নেই।'

'আমার নাম মতি। মাস্টার সাব আমারে চিনে।'

'উনি চিনলে উনার সংগে কথা বলবেন, এখন দয়া করে আমাদের বিরক্ত করবেন না।'

নীতুর টকটক করে কথা বলা শুনে শাহানা মনে মনে হাসছে। ভয়ে এই মেয়ে মরে যাচ্ছে অথচ কেমন কথা শুনাচ্ছে। নীতুর কথায় লোকটি হকচকিয়ে গেছে — বোঝাই যাচ্ছে। সে কথা বন্ধ করলেও সরে গেল না। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

নীতু বলল, জানালার সামনে বাতাস বন্ধ করে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। সরে দাঁড়ান। আমাদের অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে।

লোকটা তৎক্ষণাৎ সরে দাঁড়াল। তবে তাকিয়ে রইল শাহানার দিকে।

নীতু ফিস ফিস করে বলল, আপা দেখ, লোকটা আরেকটা বিড়ি ধরিয়েছে। আপা দেখ, কি ভাবে সে তোমাকে দেখছে। চোখে পলক ফেলছে না।

'রূপবতী একজন তরুণী গ্রামের স্টেশন ঘরে বসে আছে। তাকে তো অবাক হয়ে দেখারই কথা।'

'আপা সে এখন যাচ্ছে।'

'গুড।'

'বদমাশ সঙ্গী-সাথীদের খবর দিয়ে আনবে না তো? দেখো আপা, কি বিশ্রীভাবে লোকটা যাচ্ছে।'

'লোকটা সাধারণ মানুষের মতই যাচ্ছে — তুই ভয়ে আধমরা হয়ে আছিস বলে সাধারণ হাঁটাই তোর কাছে ভয়ংকর হাঁটা বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া ভাললোকের হাঁটা এবং মন্দলোকের হাঁটাতে কোন বেশ-কম নেই। ভাল-মন্দ মানুষের মনে, হাঁটায় নয়।'

'কি লম্বা চুল দেখ না। লম্বা চুলের মানুষ ভাল হয় না।'

'রবীন্দ্রনাথেরও লম্বা চুল ছিল। উনি কি মন্দ?'

'তুমি সবসময় স্কুল টিচারের মত কথা বল — আমার ভাল লাগে না আপা। যাদের জ্ঞান কম তারাই সব সময় জ্ঞানী জ্ঞানী কথা বলে।'

'জ্ঞানীরা কথা বলে না?'

'না, ভরা কলসির শব্দ হয় না।'

'জ্ঞানী যদি কোন কথাই না বলে তাহলে আমরা বুঝব কি করে সে জ্ঞানী? তার যে জ্ঞান আছে — সেটা বুঝানোর জন্যে তো তাকে কথা বলতে হবে। ভরা কলসির শব্দ হয় না — এটাও তো তুই ঠিক বললি না। ভরা কলসিরও শব্দ হয়, তবে অন্য রকম শব্দ। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি। তুমি নিজেকে কি মনে কর আপা? ভরা কলসি?'

শাহানা জবাব দিল না। হাসল। নীতুকে রাগিয়ে দিয়ে সে এখন খুব মজা পাচ্ছে। খুব রেগে গেলে নীতু হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করে, সেই দৃশ্য খুব মজার। নীতুর চোখ-মুখ যেমন দেখাচ্ছে মনে হয় হাত-পা ছুঁড়ে কান্না শুরুর বেশি বাকি নেই।

'আপা!'

'হুঁ।'

'লোকটা কিন্তু চলে যায়নি — ঐ দেখ দাঁড়িয়ে আছে।'

'থাকুক দাঁড়িয়ে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ভেতর যাবে কি ভাবে?'

'ভয় লাগছে তো আপা।'

'গুন গুন করে গান গা। গান গাইলে ভয় কাটে।'

'সব সময় ঠাট্টা কর কেন?'

'আচ্ছা আর ঠাট্টা করব না।'

'আপা, লোকটা শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার কি বিশ্রী চেষ্টা করছিল লক্ষ্য করেছ?'

'না। আমি তোর মত ডিটেকটিভের চোখে সব লক্ষ্য করি না।'

'আপা, কোন লোকের কথা শুনে কি বলা যায় সে কি করে, তার পড়াশোনা কতদূর?'

'না, বলা যায় না। আমাদের মেডিক্যাল কলেজে সার্জারির একজন প্রফেসর ছিলেন — খাস নেত্রকোনার গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেন। মুখ ভর্তি করে পান খান। পানের কস গড়িয়ে গড়িয়ে তাঁর শার্টে পড়ে।'

'ছিঃ!'

'তুই ছিঃ বললে হবে কি, উনি পৃথিবীর সেরা সার্জনদের একজন। চোখ বেঁধে দিলেও তিনি নিখুঁত অপারেশন করতে পারেন।'

'তিনি কি চোখ বেঁধে কখনও অপারেশন করেছেন?'

'না।'

'আপা, দেখ ঐ লোকটা নাক ঝাড়ছে।'

'নাকে সর্দি জমেছে নাক ঝাড়ছে — এটা তো নীতু দেখার মত দৃশ্য না।'

'আমার গা ঘিন ঘিন করছে আপা।'

'তুই ঐ লোকটার দিকে তাকাবি না। অন্যদিকে তাকিয়ে থাক।'

নীতু অন্যদিকে তাকাল না। লোকটির দিকেই তাকিয়ে রইল। তার গা আসলেই ঘিন ঘিন করছে। নানান কারণেই করছে। পা ধোয়া হলেও তার ধারণা পা থেকে গোবরের গন্ধ পুরোপুরি যায়নি। বাড়িতে পৌঁছেই সাবান মেখে গোসল করতে হবে। পা আলাদা করে স্যাভলন দিয়ে ধুতে হবে। কে জানে দাদার বাড়িতে স্যাভলন আছে কি–না। সঙ্গে করে স্যাভলনের একটা বড় বোতল নিয়ে আসা দরকার ছিল।

'আপা!'

'হুঁ।'

'দাদাজানের বাড়িতে কি স্যাভলন আছে?'

'নীতু! তুই মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করিস। হঠাৎ করে স্যাভলনের কথা এল কেন? তাছাড়া দাদাজানের বাড়িতে স্যাভলন আছে কি–না আমি জানব কি ভাবে?'

'লোকটা আরেকটা বিড়ি খাচ্ছে আপা। এখন চলে যাচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেল — ওর তো বিড়ি ভিজে নিভে যাবে।'

'নিভে গেলে আবার ধরাবে। পকেটে নিশ্চয়ই দেয়াশলাই আছে।'

'দেয়াশলাইও তো ভিজে যাবে।'

'প্লীজ নীতু, তুই আর একটা কথাও বলবি না। তোর কথা শুনে এখন আমার মাথা ধরে যাচ্ছে।'

'আপা লোকটা কিন্তু ভয়ংকর। ওর চোখের মধ্যে খুনী খুনী ভাব।'

'চুপ নীতু, আর একটা কথা না।'

নীতুর পর্যবেক্ষণশক্তি এবং অনুমানশক্তি দুই–ই বেশ ভাল। তবে মতির ক্ষেত্রে তার এই ক্ষমতা কাজ করেনি। মতি ভয়ংকরদের কেউ না, অতি সাধারণদের একজন। সুখানপুকুরে তার একটা গানের দল আছে। সে গানের দলের অধিকারী। লম্বা চুলের এই হল ইতিহাস। গানের দলের অধিকারীর কদমছাঁট চুলে মানায় না। মাথায় উকুন হলেও চুল লম্বা করতে হয়। নীতুর কাছে মতির চেহারা কুৎসিত এবং ভয়ংকর মনে হলেও — তার চেহারা ভাল। লম্বা চুলে তাকে ঋষি ঋষি মনে হয়। সে কথাবার্তাও ঋষির মত বলার চেষ্টা করে। মতি লম্বা রোগা একজন মানুষ। টকটকে

ফর্সা রঙ তবে এখন রোদে পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে।

মতি স্টেশন মাস্টারের খোঁজ করছিল, কারণ মাস্টার সাহেব তার কাছে সতেরো টাকা পান। অনেকদিন থেকেই পান। মতি টাকাটা দিতে পারছে না। টাকা দিতে পারছে না বলেই পাওনাদারকে এড়িয়ে চলবে, মতি সেই মানুষ না। ঠাকরোকোনা স্টেশনের আশেপাশে কোথাও এলেই সে স্টেশন মাস্টারের খোঁজ করে যায়। সতেরো টাকার কথা তার মনে আছে, এই সংবাদ এক ফাঁকে দেয়। টাকাপয়সার কারণে মানুষে মানুষে সম্পর্ক নষ্ট হয়। তার ক্ষেত্রে এটা সে হতে দিতে রাজি না।

স্টেশনঘরে মেয়ে দু'টিকে দেখে মতির বিস্ময়ের সীমা রইল না। আকাশের পরীরাও এত সুন্দর হয় না। পরী সুন্দর হয় এটা অবশ্য কথার কথা। পরীরা মোটেই সুন্দর হয় না। মতি নিজে পরী দেখেনি, তবে মতির ওস্তাদ শেলবরস খাঁ পরী দেখেছেন। শেষ বয়সে একটা পরীকে তিনি নিকাহ্ করেছিলেন। মাঝরাতে মাঝরাতে সেই পরী আসত। শেলবরস খাঁর সঙ্গে রং-ঢং করে শেষরাতে চলে যেত। শেলবরস খাঁ নিজের মুখে বলেছেন — পরী দেখতে সুন্দর না। এরার মুখ ছোট ছোট। ইঁদুরের দাঁতের মত ধারালো দাঁত। গায়ে মাছের গন্ধের মত গন্ধ। আর এরা বড় ত্যক্ত করে।

মতি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে জগলুর চায়ের স্টলে গিয়ে বসল। জগলু বিরক্ত চোখে তাকাল। মতির মনটা খারাপ হয়ে গেল — কাস্টমার এসেছে, কোথায় খাতির-যত্ন করে বসাবে তা না, এমন ভাব করছে যেন . . .

মতি বলল, জগলু ভাই আছেন কেমন, ভাল?

জগলু হাই তুলল। জবাব দিল না।

'দেখি চা দেন। বাদলা যেমন নামছে চা ছাড়া গতি নাই।'

জগলু নিঃশব্দে গ্লাসে লিকার ঢালছে। তার মুখের বিরক্তি আরো বেড়েছে। বিরক্তির কারণ হচ্ছে — সে মোটামুটি নিশ্চিত মতির কাছে পয়সা নেই। দীর্ঘদিন চায়ের স্টল চালাবার পর তার এই বোধ হয়েছে — কার কাছে পয়সা আছে, কার কাছে নেই তা সে আগেভাগে বলতে পারে। বিনা পয়সার খরিদ্দার দোকানে ঢুকেই গাজ্যের গল্প শুরু করে। জগলুকে জগলু না ডেকে ডাকে জগলু ভাই। চা মুখে দিয়েই বলে ফাস্ক্লাস চা হইছে জগলু ভাই। মতিও তাই করবে।

মতি চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, চা জবর হইছে জগলু ভাই। তারপর কন দেখি, আপনেরার খবর কি?

'খবর নাই।'

'মাস্টার সাবের খুঁজে গিয়া এক ঘটনার মধ্যে পড়লাম . . . দেখি পরীর মত দুই মেয়ে . . .'

জগলু মতির কথা থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, চা শেষ কর মতি — দোকান বন্ধ করব।

চা তাড়াহুড়ো করে খাওয়ার জিনিশ না। আরাম করে খেতে হয়। জগলুর দোকানে চা-টা বানায় ভাল। আফিং-টাফিং দেয় কি-না কে জানে। আরেক কাপ খেতে ইচ্ছা করছে কিন্তু মতির হাতে আসলেই পয়সা নেই। বাকিতে একবার চা খাওয়া যায়, পরপর দু'বার খাওয়া যায় না।

'চা আরেক কাপ খাওন লাগব জগলু ভাই — সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজছি — শরীর মইজ্যা গেছে।'

'চায়ের দাম কিন্তু বাড়ছে — এক টেকা কাপ। দুই কাপ দুই টেকা।'

'কন কি?'

'কুড়ি টেকা সের চিনি — পনেরো টেকা গুড়। আমার হাত বান্দা।'

'আচ্ছা দেন, উপায় কি!'

জগলুর মুখের বিরক্তি ভাব এখন কিছুটা দূর হয়েছে। কথা শুনে মনে হচ্ছে — মতির হাতে পয়সা আছে। চায়ের দাম দেবে। তার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করা যেতে পারে।

'স্টেশন ঘরে কি দেখলা বললা না?'

'পরীর মত দুই মেয়ে। যেমন সুন্দর চেহারা তেমন সুন্দর কথা।'

'বিষয় কি?'

'জানি না। জিজ্ঞাস করলাম, কিছু বলে না। এরা হইল শহরের মেয়ে, আর আমার হইল আউলা-বাউলা চেহারা। চেহারা দেইখ্যাই ভয় পাইছে। মেয়ে দুইটার পরিচয় জাননের ইচ্ছা ছিল।'

'পরিচয় জাইন্যা হইব কি?'

'তবু পরিচয় জানার ইচ্ছা হয়। দুইটা পিঁপড়া যখন সামনাসামনি দেখা হয় — তারা থামে। সালাম দেয়, কোলাকুলি করে, একজন আরেকজনের খোঁজখবর নেয়, আর আমরা হলাম মানুষ . . .।'

মতি সুযোগ পেয়েই ঋষির মত এক বাণী দিয়ে ফেলল। পিঁপড়াদের জীবনচর্যা বিষয়ক এই বাণী সে প্রায়ই দেয়। জগলুর উপর এই বাণী তেমনি প্রভাব ফেলল না। সে হাই তুলল।

মনসুর আলি সাহেব হন হন করে আসছেন। তিনি পয়েন্টসম্যান বদরুলকে খুঁজে পেয়েছেন। বদরুল তাঁর মাথার উপর ছাতা ধরে আছে। মনসুর আলির হাতে ছোট একটা এলুমিনিয়ামের কেতলি। অন্য হাতে দু'টা চায়ের কাপ। মনসুর আলির চোখে সমস্যা আছে — কাছাকাছি কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও চিনতে পারেন না। আজ

মতিকে দূর থেকে চিনে ফেললেন — খুশি খুশি গলায় বললেন, কে, মতি না?

মতি হাসিমুখে বলল, স্যারের শরীর কেমন?

'শরীর ভাল। তুই এখানে করছিস কি?'

'চা খাই।'

'চা পরে খাবি — তুই আমার একটা কাজ করে দে। বিরাট ঝামেলায় পড়েছি। ইরতাজুদ্দিন সাহেবের দুই নাতনী এসে উপস্থিত। স্টেশন ঘরে বসে আছে। ওদের সুখানপুকুর নিয়ে যাবি। পারবি না?'

'অবশ্যই পারব।'

'নৌকা জোগাড় কর্। ভাল ইঞ্জিনের নৌকা। নিচে বিছানা দিতে হবে। পারবি না?'

'মানুষ পারে না এমন কাজ দুনিয়াতে আল্লাহ্‌পাক দেয় নাই। হযরত আদমকে পয়দা করার পর আল্লাহ্‌পাক বললেন — ওহে আদম . . . '

'বড় বড় কথা বলার কোন দরকার নাই — তুই যা, নৌকা জোগাড় কর্। আর শোন্ — তোর বেশি কথা বলার অভ্যাস। বেশি কথা বলবি না।'

'জ্বে আচ্ছা।'

'জ্বে আচ্ছা না — কোন কথাই বলবি না।'

'জ্বে আচ্ছা, বলব না — তবে ইরতাজ সাহেবের যখন নাতনী তখন তো আমরার গ্রামেরই মেয়ে . . .।'

'খবর্দার। গ্রামের মেয়ে আবার কি?'

মনসুর আলিকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি এখন পুরোপুরি দুঃশ্চিন্তামুক্ত হয়েছেন। ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে রোগি বিছানায় উঠে বসেছে। মনসুর আলি জগলুর দিকে তাকিয়ে বললেন — মতির চায়ের পয়সা আমি দেব। ওর কত হয়েছে?'

'দুই কাপ চা খাইছে। দুই টাকা।'

মনসুর আলি আনন্দিত গলায় বললেন — তুই তাহলে নৌকার খোঁজে চলে যা। নৌকা পেলে আমাদের খবর দিবি।

'জ্বি আচ্ছা।'

মতি মাথা চুলকে বলল, আফনের টাকাটার একটা ব্যবস্থা স্যার করতেছি। সতেরো টাকা পাওনা ছিল, স্যারের বোধ হয় ইয়াদ আছে।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

মনসুর আলি কেতলিতে করে নিজের বাড়ি থেকে চা বানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। জগলুর দোকানে কেতলি গরম করলেন। এক পোয়া জিলাপি কিনলেন — মেয়ে দু'টির নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে — এমন জংলী জায়গা . . . কিছু পাওয়ার উপায়

নেই।

'মতি!'

'জ্বি স্যার।'

'কথা কম বলবি — এরা শহরের বড়ঘরের মেয়ে। চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে। কথা শুনলে বিরক্ত হয় — কি দরকার বিরক্ত করার।'

'বিরক্ত করব না।'

'নৌকায় উঠেই ফট করে গানে টান দিবি না। এরা শহর-বন্দরে থাকে, গ্রাম্য গান শুনলে বিরক্ত হবে। কোন গান না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

মনসুর আলি আবার তৃপ্তির হাসি হাসলেন। মতিকে পেয়ে তাঁর সত্যি ভাল লাগছে।

নীতু উৎসাহের সঙ্গে বলল, আপা, স্টেশন মাস্টার সাহেব আসছেন।

'তুই তো বিড়াল হয়ে যাচ্ছিস রে নীতু। অন্ধকারে সব দেখতে পাস। আমি তো কিছু দেখি না। উনি কি খালি হাতে আসছেন, না চা নিয়ে আসছেন?'

'চা নিয়ে আসছেন, হাতে কেতলি আছে।'

'চা-টা গরম, না ঠাণ্ডা?'

'সেটা বুঝব কি করে?'

'চা গরম হলে কেতলির মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুবে। ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছিস না? তুই তো মনে হয় আলোর চেয়ে অন্ধকারেই ভাল দেখিস . . .।'

বৃষ্টি কমে এসেছিল, আবার প্রবলবেগে শুরু হল। হারিকেনে সম্ভবত তেল নেই — উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। তেল ভরা থাকলে এত সুন্দর করে জ্বলত না।

মনসুর আলি বললেন, আম্মারা, চা খান। চিন্তার আর কিছু নাই। সব ব্যবস্থা হয়েছে।

শাহানা বলল, কি ব্যবস্থা হয়েছে?

ব্যবস্থা তেমন কিছু হয়নি, শুধু মতিকে পাওয়া গেছে। মতি সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। মনসুর আলি এই ভরসাতেই বলেছেন সব ব্যবস্থা হয়েছে।

নীতু বলল, আমরা যাব কি ভাবে? হেঁটে?

'জ্বি না আম্মা, নৌকায় যাবেন।'

'নৌকায় কতক্ষণ লাগবে?'

নৌকায় কতক্ষণ লাগবে সেই সম্পর্কেও তাঁর কোন ধারণা নেই। নৌকায় করে

তিনি কখনো সুখানপুকুর যাননি। নৌকায় যেমন যাননি — হেঁটেও যাননি। যাবার প্রয়োজন পড়েনি। তবে এবার যাবেন। মেয়ে দু'টি থাকতে থাকতে যাবেন। ইরতাজুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসবেন। এদের একটা-দু'টা কথায় অনেক কিছু উলটপালট হয়। তিনি সাত বছর এই জঙ্গলে পড়ে আছেন। তাঁর জুনিয়ররা প্রমোশন নিয়ে ভাল ভাল স্টেশন পেয়েছে। তাঁর কিছু হয়নি। মাঝে মাঝে তাঁর সন্দেহ হয় রেলওয়ের খাতায় তাঁর নাম আছে কি-না। ইরতাজুদ্দিন সাহেবকে দিয়ে একটা কথা রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কানে তুলতে পারলে —

'আম্মারা, জিলাপি খান। সন্ধ্যার সময় ভাজে। কারিগর ভাল —।'

নীতু বলল — যে জিলাপি ভাজে তাকে কি কারিগর বলে?

'ভাল ভাজলে কারিগর বলে।'

নীতু জিলাপি এক টুকরা মুখে দিল। ন্যাতন্যাতে জিলাপি — টক টক লাগছে — একবার মুখে দিয়ে ফেলে দেয়াও যায় না — অভদ্রতা হয়। ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন তার দিকে। শাহানা সহজভাবে বলল, মুখে জিলাপি দিয়ে বসে আছিস কেন? ভাল না লাগলে ফেলে দে। নীতু তৎক্ষণাৎ জানালার কাছে চলে গেল। জিলাপি ফেলে দিলে এখন আর অভদ্রতা হবে না। সে নিজ থেকে ফেলেনি — অন্যের কথায় ফেলেছে।

শাহানা বলল, আমরা কখন রওনা হব?

'নৌকা ঠিক হলে খবর দিবে। তখন আল্লার নাম নিয়ে রওনা দিব।'

'আপনি কি যাবেন আমাদের সঙ্গে?'

'জ্বি না আম্মা। মতি যাচ্ছে, অসুবিধা হবে না। খুব বিশ্বাসী ছেলে।'

নীতু বলল, অবিশ্বাসী ছেলে হলে কি করত? আমাদের খুন করে, সুটকেস-টুটকেস নিয়ে চলে যেত?

স্টেশন মাস্টার সাহেব অবাক হয়ে নীতুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি অদ্ভুত কথা যে মেয়েটা বলে! শাহানা মুখ টিপে হাসছে . . .

ইঞ্জিন বসানো দেশী নৌকা। মাথার উপর ছই আছে। নিচে তোষক-চাদর-বালিশ দিয়ে সুন্দর বিছানা করা। চাদর বালিশ সবই পরিষ্কার। ছই থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা এক হারিকেন। বালিশের কাছে একটা লম্বা টর্চ লাইট। নৌকা শাহানার খুব পছন্দ হল। শুধু ইঞ্জিনের ব্যাপারটা পছন্দ হল না — সারাক্ষণ ভট ভট শব্দ হবে — কিছুক্ষণের মধ্যে মাথা ধরে যাবে। এখনো মাথা ভারি ভারি লাগছে। মতি নামের যে বিশ্বাসী লোকের কথা বলা হয়েছিল, দেখা গেল, সে নীতুর অপরিচিত নয়। স্টেশন ঘরের জানালায় তার মুখই দেখা গিয়েছিল — তখন তার মুখ যতটা ভয়ংকর

লেগেছিল — এখন ততটা ভয়ংকর লাগছে না। নীতুর কাছে এখন লোকটাকে একটু যেন হাবার মত লাগছে। লোকটার পরনে লুঙ্গি না — পায়জামা পাঞ্জাবি। পায়জামা আবার হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। খালি পা। খালি পায়ে কেউ পায়জামা পাঞ্জাবি পরে ঘুরে?

নীতু বলল, আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল না?

মতি লজ্জিত গলায় বলল, জ্বি।

মতি ইঞ্জিন চালুর ব্যাপারে সাহায্য করছে। ঠাণ্ডায় ইঞ্জিন বসে গেছে মনে হয়। স্টার্ট নিচ্ছে না।

শাহানা বলল, ইঞ্জিনের নৌকা জোগাড় করেছেন?

'জ্বি। দেড় ঘণ্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ্‌ পৌঁছে যাব।'

'ইঞ্জিন না চালিয়ে যাওয়া যায় না?'

'অবশ্যই যাবে। এক সময় তো আমরা ইঞ্জিন ছাড়াই চলাফেরা করতাম। এখন না ইঞ্জিন হইল। ভটভটি ইঞ্জিন।'

'ইঞ্জিন ছাড়া কতক্ষণ লাগবে?'

'ভাল মাঝি হইলে চার-পাঁচ ঘণ্টা।'

'আমাদের মাঝি কেমন? মাঝি যদি ভাল হয় তাহলে ইঞ্জিন ছাড়া চালাতে বলুন — দরকার হলে কোনখান থেকে আরেকজন মাঝি জোগাড় করে আনুন। অনেকদিন নৌকায় চড়া হয়নি। চড়ার সুযোগ যখন পাওয়া গেছে — ভালমত চড়া যাক। চার-পাঁচ ঘণ্টা এমন কিছু বেশি সময় না।'

নীতু বলল, চার-পাঁচ ঘণ্টা অনেক সময় আপা।

'অনন্ত মহাকালের কাছে চার-পাঁচ ঘণ্টা কিছুই না নীতু।'

'আমার তো ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুম পেলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়। সকালে ঘুম ভেঙে দেখবি দাদাজানের বাড়ির ঘাটে নৌকা থেমে আছে।'

'চার-পাঁচ ঘণ্টা নৌকায় থাকলে নিশ্চয় আমাদের ডাকাতে ধরবে। আমার মন বলছে, এই অঞ্চলে খুব ডাকাতি হয়। আচ্ছা শুনুন, এই অঞ্চলে ডাকাতি হয় না?'

প্রশ্নটা করা হল মতিকে, জবাব দিল মাঝি। সে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল — ডাকাতি বলতে গেলে রোজ রাইতে হয় — গত পরশু মোকামঘাটায় গয়নার নৌকায় বিরাট ডাকাতি। ডাকাইতে রামদা দিয়া হাতে কোপ দিছে।

নীতু ভীত গলায় বলল, মোকামঘাটা এখান থেকে কতদূর?'

'তা ধরেন আফনের সোয়া মাইল।'

'আমরা কি মোকামঘাটা হয়ে যাব?'

'হুঁ।'

নীতু বলল — আপা শুনছ উনি কি বলছেন? মোকামঘাটায় ডাকাতরা রামদা দিয়ে কোপ মারে।

শাহানা বলল, আমাদের নৌকার ইঞ্জিন থাকবে বন্ধ। কোন রকম সাড়াশব্দ হবে না। আমরা চুপি চুপি পার হয়ে চলে যাব। ডাকাতরা বুঝতেও পারবে না।

'তোমার মাথা যে খারাপ এটা কি তুমি জান আপা?'

'জানি।'

'না, তুমি জান না। তোমার মাথা ভয়ংকর খারাপ। এই ব্যাপারটা শুধু যারা তোমার কাছাকাছি থাকে তারা জানে। আর কেউ জানে না। তোমার যে শুধু নিজেরই মাথা খারাপ তাই না — তোমার আশেপাশে যারা থাকে তাদের মাথাও তুমি খারাপ করে দাও। নৌকায় যখন ডাকাত পড়বে তখন তুমি কি করবে?'

'এমন অদ্ভুত কিছু করব যেন ডাকাতরা পুরোপুরি হকচকিয়ে যায়। যেমন ধর, ডাকাতদের যে হেড তাকে বলব — ভাই, আপনি কি গান গাইতে পারেন?'

'তোমার এই সস্তা রসিকতায় আমি কিন্তু মোটেই মজা পাচ্ছি না, আপা।'

'তুই মজা না পেলেও অন্যরা কিন্তু পাচ্ছে।'

অন্যরা যে মজা পাচ্ছে — তা সত্যি। নীতু নৌকার মাঝিকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার বিশ্রী ভ্যাক ভ্যাক হাসি শোনা যাচ্ছে। মতি নামের লোকটা এ রকম বিশ্রী করে না হাসলেও — হাসছে। দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। নীতুর গা জ্বালা করতে লাগল।

শাহানা বলল, নীতু, তুই আমার কথা শোন — টেনশানে তুই অসুখ বাঁধিয়ে ফেলবি। ধাই করে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে, রক্তে সুগার যাবে কমে . . . তুই নিশ্চিন্ত হয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে থাক . . . যা হবার হবেই . . . আগেভাগে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বর্তমান নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তুই আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাক তো। কি সুন্দর ঝমঝমে বৃষ্টি! এই বৃষ্টির ভেতর নৌকা নিয়ে যাওয়া কত ইন্টারেস্টিং এডভেঞ্চার! আয় নীতু।

নীতু এগিয়ে এল এবং আপার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। সে মতির দিকে তাকিয়ে বলল, মোকামঘাটা পার হলে দয়া করে আমাকে ডেকে তুলবেন।

'জ্বি আচ্ছা।'

নৌকা চলতে শুরু করছে। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে — হঠাৎ হঠাৎ একটা-দু'টা ফোঁটা শুধু পড়ছে। মতি হাতে লগি নিয়েছে। পেছনের মাঝি দাঁড় টানছে, মতি লগি ঠেলছে। লগি ঠেলে অভ্যাস নেই। কষ্ট হচ্ছে। উপায় কি! নীতু ছইয়ের ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে সে পানিতে হাত দিচ্ছে। কি ঠাণ্ডা পানি! পানিতে হাত দিতে

তার খানিকটা ভয় ভয়ও লাগছে। পানি থেকে সাপখোপ যদি তার গা বেয়ে উঠে আসে!

ভীতু মানুষকে ভয় দেখাতে খুব ভাল লাগে। নৌকার মাঝি দ্বিতীয় ভয়ের গল্প ফাঁদল।

'ছোট আফা, পানির মইধ্যে কিন্তুক হাত দিবেন না। পানির মইধ্যে কুম্ভীর আছে।'

নীতু বিরক্ত গলায় বলল, ময়মনসিংহের নদীর পানিতে কুমীর থাকবে কেন? কুমীর থাকবে সমুদ্রের কাছাকাছি নদীতে।

'এইটাই তো আচানক কথা। গত বছর বাইস্যা মাসে কারেন্ট জালে এক কুম্ভীর ধরা পড়ল।'

'কুম্ভীর বলছেন কেন? বলুন কুমীর। কুমীর বলা তো কুম্ভীর বলার চেয়ে অনেক সহজ। যুক্তাক্ষর নেই।'

'ঘটনাটা কি হইছে শুনেন আফা। সে এক ইতিহাস। আলিশান এক কুম্ভীর। এক গজ দুই ফুট লম্বা। দর্জির দোকানের গজ ফিতা আইন্যা মাপা হইল।

'দয়া করে মিথ্যা গল্প বলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবেন না। এক গজ দু'ফিট লম্বা কুমীর এখানকার নদীতে কখনো পাওয়া যাবে না।'

'ঘটনা কিন্তুক সত্য আফা।'

'না ঘটনা সত্য না, ঘটনা মিথ্যা।'

নীতুর রাগ দেখে মাঝি হেসে ফেলল। কাউকে রাগতে দেখে আনন্দিত হবার সুযোগ তো সচরাচর পাওয়া যায় না। মাঝি শব্দ করে হাসছে। মাঝির সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে হাসছে মতি। হাসছে মুখ ঘুরিয়ে। হাসি দেখিয়ে মেয়েটিকে সে আরো রাগাতে চায় না। মতি বলল, বিরাট হৈ-চৈ হইছিল। ইত্তেফাক পত্রিকায় কুমীরের ছবি ছাপা হয়েছিল। এখনো লোকে ভয়ে নদীতে গোসল করে না।

নীতু থমথমে মুখে বলল, এটা সত্যি হতে পারে না। পত্রিকায় অনেক মিথ্যা খবর ছাপা হয়।

'এই খবরটা সত্যি ছিল।'

'আপনি কি দেখেছিলেন কুমীরটা?'

'হ্যাঁ। নিজের চোখে দেখা। মানুষের মধ্যে যেমন অনেক পাগল মানুষ থাকে — যা করার কথা না, অন্যে যা করে না, তাই করে। পশু-পাখি, জীব-জানোয়ারের ভিতরেও সে রকম থাকে। ঐ কুমীরটার ছিল মাথা খারাপ। তার থাকার কথা ছিল সমুদ্রের কাছে। তা না কইরা উজানের দেশ দেখতে আইস্যা মারা পরল।'

শাহানা কৌতূহলী হয়ে কথা শুনছে। মাথা-খারাপ কুমীরের কথা মাঝি শ্রেণীর

কোন যুবকের মুখ থেকে সচরাচর শোনার কথা না। কিংবা কে জানে এই শ্রেণীর যুবকেরা হয়ত এভাবে কথা বলেই অভ্যস্ত।

নীতু বলল, তারপর কুমীরটাকে গ্রামের মানুষ কি করল?

'দড়ি দিয়ে তিনদিন বাঁধা ছিল। তারপর পিটাইয়া মারল।'

'কেন?'

'কুমীরের কপালে ছিল মরণ লেখা।'

'তারপর কি হল?'

'কুমীরের দাঁতগুলি বিক্রি হইল। একেকটা দাঁত তিন টাকা। কুমীরের দাঁত দিয়া ভাল তাবিজ হয়। আমরার এলাকায় কিছু গারো মানুষ আছে। তারা কুমীরটা পঞ্চাশ টাকায় কিনল।'

'কেন?'

'রাইন্দা খাইছে। পেট ভর্তি ছিল ডিম। ডিমগুলো আলাদা রান্না করছে আর শরীরটা আলাদা। ডিমগুলো খুব স্বাদ হইছিল।'

'বুঝলেন কি করে যে স্বাদ হয়েছিল? আপনি খেয়ে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ একটা খাইছি। মুরগির ডিমের মতই। বেবাক কুসুম — শাদা অংশ কম।'

'আপনি সত্যি কুমীরের ডিম খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কথা আমি প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম — এখন বুঝতে পারছি — আপনার সব কথা মিথ্যা। কুমীরের ডিম খাওয়ার কথা বলে আপনি ধরা পড়ে গেছেন।'

মতি হাসছে — শব্দ করে হাসছে। মাঝিও হাসছে। নীতু রাগ করে নৌকার ছইয়ের ভেতর চলে গেল। ফিসফিস করে বলল, আপা, লোকটা কি বলছিল তুমি কি শুনছিলে?

'হুঁ।'

'তোমার কি ধারণা লোকটা কুমীরের ডিম খেয়েছে?'

'খেতে পারে। কিছু কিছু মানুষের স্বভাব হচ্ছে যে সে অন্যের চেয়ে আলাদা এটা প্রমাণ করার জন্যে উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করা। লোক-দেখানো ব্যাপার আর কি। একজন হা করে তাকিয়ে থাকবে, দেখবে, বিস্মিত হবে — এতেই আনন্দ।'

'এরকম লোক সংখ্যায় খুব কম, তাই না?'

'না, সংখ্যায় অনেক বেশি।'

নীতু ফিসফিস করে বলল, আপা, কথাবার্তা আরো আস্তে বল — ঐ লোক শুনছে। মতি নামের কুমীরের ডিম খাওয়া লোকটা।

'শুনুক না — গোপন কিছু তো বলছি না।'

'তবু আমাদের কথা অন্য মানুষ কেন শুনবে? মিথ্যাবাদী একজন মানুষ? আমার উনাকে অসহ্য লাগছে। শুধু শুধু কেন মিথ্যা বলবে?'

'শুধু শুধু মানুষ কখনো মিথ্যা বলে না। মিথ্যা যদি বলে থাকে তাহলে উদ্দেশ্য আছে — তবে আমার মনে হয় সত্যি কথাই বলছে —।

'তোমার এরকম মনে হবার কারণ কি?'

'গ্রামের মানুষ তো। এরা মিথ্যা কম বলে — ।'

'শহরের লোক মিথ্যা বেশি বলে?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'শহরের লোকদের মিথ্যা বলার প্রয়োজন যতটা গ্রামের লোকদের ততটা না, এই জন্যে কম বলে।'

নৌকা হঠাৎ দুলতে শুরু করেছে — এপাশ-ওপাশ করছে। নীতু চট করে ওঠে বসে আতংকিত গলায় বলল, কি হচ্ছে আপা? শাহানা জবাব দেবার আগেই মতি বলল, নৌকা বিলের মুখে পড়ছে এই জন্যে ঢেউ বেশি, ভয়ের কিছু নাই। ঢেউ থাকব না। এইগুলা হইল দেখন-ঢেউ। কামের ঢেউ না।

নীতু ফিসফিস করে বলল — তোমাকে বলেছিলাম না আপা, আমাদের সব কথা শুনছে। কেউ আড়াল থেকে কথা শুনলে আমার ভাল লাগে না।

'তাহলে কথা বলিস না, চুপচাপ শুয়ে থাক।'

নীতু বাধ্য মেয়ের মত আবার শুয়ে পড়ল। মতি বলল, ভিতরের হারিকেনটা নিভাইয়া দেন।

শাহানা বলল, কেন?

'আন্ধাইর খুব জবর। ভিতরে হারিকেন জ্বললে বাইরের কিছু দেখা যায় না। দিক ভুল হয়। হারিকেন নিভাইয়া টর্চ লাইটটা আমার হাতে দেন।'

শাহানা হারিকেন নিভিয়ে দিতেই চারদিকের অন্ধকার যেন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পেছনের মাঝি বলল, আরে সববনাশ! কি আন্ধাইর রে! জন্মের আন্ধাইর।

নীতু শাহানার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল — আপা, লোকটার অন্য কোন মতলব নেই তো? হারিকেনটা নিভিয়ে দিতে বলল কেন?

'লোকটাকেই জিজ্ঞেস কর, আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন?'

'তুমি তো পৃথিবীর সব প্রশ্নের উত্তর জান। এই জন্যে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।'

'তোর এই প্রশ্নের উত্তর শুধু এই লোকটাই জানে।'

'স্টেশন থেকেই আমার মনে হচ্ছে লোকটা খারাপ —। আমার ভয় লাগছে

আপা। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখ। আমার শরীর কাঁপছে। আপা, পানি খাব।'

নীতু আসলেই থর থর করে কাঁপছে। হঠাৎ অন্ধকার হওয়াতেই মনে হয় এই কাণ্ডটা ঘটেছে। নীতুর হার্টের কোন অসুখ-টসুখ নেই তো?

শাহানা নৌকার ছইয়ের ভিতর থেকে মাথা বের করে বলল — শুনুন, নীতু খুব ভয় পাচ্ছে। হারিকেনটা জ্বালাতে হবে।

মতি বলল, আপনি পারবেন না, আমি জ্বালায়ে দিব। ভয়ের কিছু নাই। ঢেউ থাকব না।

'ও ঢেউকে ভয় পাচ্ছে না। আপনাকে ভয় পাচ্ছে। ওর ধারণা, আপনি খারাপ লোক। আপনার মতলব ভাল না।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর হাসির শব্দ শোনা গেল। এমন জোরালো হাসি শাহানা অনেকদিন শুনেনি। মতি হাসছে — মতির সঙ্গে মাঝিও যোগ দিয়েছে। তাদের হাসি আর থামছে না। হাসির মাঝখানে শাহানা নিচু স্বরে বলল — হাসির শব্দ শুনে তোর ভয় কেটেছে, না?

নীতু বলল, হ্যাঁ কেটেছে।

'ভয়ংকর লোকজনও কিন্তু হাসতে পারে। একজন লোক শব্দ করে হাসলেই ধরে নিবি সে ভাল লোক তা কিন্তু না। তারপরেও হাসির শব্দ শুনলেই আমাদের ভয় কেটে যায়। কেন বল্ তো?'

'জানি না আপা।'

'আমি নিজেও জানি না।'

মতি বলল, দেখি হারিকেনটা দেন। ধরাই।

নীতু বলল, হারিকেন ধরাতে হবে না। আপনি নৌকা চালান। আমার ভয় কেটে গেছে।

মতি বলল, ভয় কাটল কেন?

'জানি না।'

পেছনের মাঝি বলল, আমরার মতি ভাইজান এমন মানুষ যারে পিঁপড়ায়ও ডরায় না।

নীতু বলল, আপনাকে পিঁপড়াও ভয় পায় না — এটা কি সত্যি?

'পিঁপড়া কোন মানুষরেই ডরায় না। ডরাইলে মানুষের মইধ্যে এত সহজে চলাফেরা করত না।'

নীতু ফিসফিস করে শাহানাকে বলল — আপা, এই লোকটারও তোমার মত জ্ঞানী-জ্ঞানী কথা বলার অভ্যাস।

'তাই তো দেখছি।'

'তোমার কি ধারণা — উনি কি করেন?'

'আমার ধারণা কিছুই করে না। যারা কিছুই করে না জ্ঞানী-জ্ঞানী কথা বলার দিকে তাদের প্রবল ঝোঁক থাকে। সব গ্রামে যেমন একটা করে পাগল থাকে তেমনি সব গ্রামে একটা করে অপদার্থ জ্ঞানী লোক থাকে। তারা অন্যদের মত লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে না। শার্ট-পেন্ট পরে খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়। লম্বা চুল রাখে, শুদ্ধ কথা বলার চেষ্টা করে এবং মাঝে মাঝে উদ্ভট কথা বলে মানুষদের চমকে দেবার চেষ্টা করে।'

নীতু বলল, আমাদের এত সহজে চমকাতে পারবে না, তাই না আপা?

'হ্যাঁ — আমাদের চমকানো খুব কঠিন বরং আমরা তাকে অতি সহজেই চমকে দিতে পারি।'

'ইঞ্জিন ছাড়া নৌকা চালাতে বলে তুমি তো প্রথমেই চমকে দিয়েছ?'

শাহানা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল — তোর খুব বুদ্ধি নীতু। তোর বুদ্ধি দেখে আমি নিজেই মাঝে মাঝে চমকে যাই।

'আপা!'

'হুঁ।'

'মাঝি যে বলল উনাকে পিঁপড়াও ভয় পায় না — এটা কেন বলল?'

'গ্রামের মানুষ বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা বলতে পছন্দ করে এই জন্যে বলেছে। এইসব হচ্ছে কথার কথা। যেমন, সে আমাদের সম্পর্কে অন্যদের কাছে বলবে — আজ রাতে নৌকায় দু'টা মেয়েকে পার করেছি। দু'টাই পরীর মত সুন্দর। এর মধ্যে একটা মেয়ে এমন ভয় পাচ্ছিল, ভয়ে কিছুক্ষণ পর পর ফিট হচ্ছিল। কি, বলবে না এরকম?'

নীতু হাসিমুখে বলল, মনে হচ্ছে বলবে। আপা শোন, তুমি আরও নিচু গলায় কথা বল — আমার মনে হয় ঐ লোকটা আমাদের সব কথা শুনছে।

'না শুনছে না। ও নৌকা চালাতেই ব্যস্ত।'

নীতু গলা বের করে মতির দিকে তাকিয়ে বলল — আচ্ছা, আপনি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন?

মতি বলল, জ্বি পাইতেছি। নৌকার ছইয়ের ভেতরে ফিসফিস কইরা কথা বললেও বাইরে থাইক্যা পরিষ্কার শোনা যায়। ছইয়ের পেছনে পর্দা না থাকলে শোনা যাইত না — বাতাসে শব্দ ভাইস্যা যাইত। পিছনে পর্দা, এই জন্যে সব শুনতাছি।

'আমাদের কথায় রাগ করেননি তো?'

'জ্বি না।'

শীতে মতির শরীর কাঁপছে। ভেজা পাঞ্জাবিটা গা থেকে খুলে ফেলতে পারলে শীত কম লাগত। মেয়ে দু'টাও তাকিয়ে আছে, পাঞ্জাবি খোলা ঠিক হবে না।

ইরতাজুদ্দিন সাহেবের নাতনী, এদের সামনে আদবকায়দার বরখেলাফ করা যায় না। মতির ধারণা, ইতিমধ্যেই সে আদবকায়দা অনেক বরখেলাফ করে ফেলেছে। মাস্টার সাহেব তাকে কথা কম বলতে বলেছেন, সে কথা কম বলেনি। বেশিই বলেছে। কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে। কারণ ছাড়াই কথা বলতে ইচ্ছা করে। মেয়ে দু'টা সেই রকম। তবে বেশি সুন্দর। বেশি সুন্দর মানুষকে আপন বলে মনে হয় না, পর পর লাগে।

শাহানা বলল, আপনি কি করেন?

মতি লজ্জিত গলায় বলল, কিছু করি না। আফনের আন্দাজ ঠিক আছে।

মাঝি পেছন থেকে বলল, মতি ভাই হইল আফনের গানের দলের অধিকারী।

শাহানা বলল, সেটা কি?

মতি আগের চেয়েও লজ্জিত গলায় বলল — আমার একটা গানের দল আছে। ছোট দল।

'বলেন কি? আপনি তাহলে মিউজিক্যাল ট্রুপের কনডাক্টার? ইন্টারেস্টিং তো।'

মতি অস্বস্তি ঢাকার জন্যে কয়েকবার কাশল। গানের দল করা এমন কোন কাজ না যে বড় গলায় বলতে হয়। এইসব পরিচয় গোপন রাখাই ভাল। গ্রামাঞ্চলে কাজকর্মহীন 'বাদাইম্যা'রা গানের দল করে, যাত্রার দল করে।

নীতু শাহানার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। নৌকার দুলুনীতে শাহানারও ঘুম আসছে।

'গানের দল ছাড়া আপনি আর কিছুই করেন না?'

মতি জবাব দিল না। অস্বস্তি ঢাকার জন্যে অকারণে কাশতে লাগল।

শাহানা বলল, গানের দল যারা করবে অন্য কিছু করার তাদের সময়ই বা কোথায়? এইসব হল ক্রিয়েটিভ কাজ, সৃষ্টিশীল কাজ। সৃষ্টিশীল কাজ যারা করে তারা অন্য কিছু করতে পারে না। তাদের মাথায় সব সময় একটা কাজই ঘুরে তো, সেই জন্যেই পারে না।

মতি মুগ্ধ হয়ে গেল। কি সুন্দর কথা! এ রকম সুন্দর কথা এই জীবনে কেউ তাকে বলেনি।

'আপনার দল নিয়ে একদিন একটা উৎসব করবেন। আমরা শুনব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনাদের ক'জনের দল?'

'চাইর জনের।'

'বাহ্, সুন্দর তো — বিটলসদের দলেও ছিল চারজন।'

মতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, আমরার মইধ্যে সবচে' ওস্তাদ হইল আফনের পরাণ

কাকা। ঢোল বাজায়। হাতের মধ্যে আছে মধু। আহা রে কি বাজনা!'

'আপনি কি করেন?'

'আমি গান গাই — গলা ভাল না — মোটামুটি। তয় আফনের দরদ দিয়া গাই — গলার অভাব এই কারণে লোকে ধরতে পারে না।'

শাহানা হাসল। মতি উৎসাহের সঙ্গে বলল — পরাণ কাকার ঢোল শুনলে আফনের সারা জীবন মনে থাকব — আহা কি জিনিস!

'শুনব, উনার ঢোল শুনব।'

'উনার মন-টন বেশি ভাল না — স্ত্রীর সন্তান হবে। শেষ বয়সে সন্তান।'

'শেষ বয়সে সন্তান হলে চিন্তা হবারই কথা।'

'আরেকজন আছে আবদুল করিম, বেহালাবাদক। তয় উনারে এখনো দলে নিতে পারি নাই। চেষ্টায় আছি।'

'উনিও খুব ভাল?'

'আমার টেকা থাকলে উনার দুইটা হাত রূপা দিয়া বান্ধাইয়া দিতাম।'

'সোনা দিয়ে বান্ধাতেন না কেন? সোনা দিয়ে বান্ধানো ভাল না?'

'পুরুষছেলের জন্যে সোনা নিষিদ্ধ। এই জন্যে রূপার কথা বলেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'আফনের সঙ্গে অনেক আজেবাজে কথা বইল্যা ফেলছি। মনে কিছু নিবেন না।'

'কিছু মনে করব না। তাছাড়া আপনি আজেবাজে কথা কিছু বলেনওনি। সুখানপুকুর আর কতদূর?'

'বেশি দূর না। আইস্যা পড়ছি। ধরেন আর এক ঘণ্টা।'

শাহানা চুপ করে আছে। মতি ক্লান্ত হয়ে লগি কোলের উপর নিয়ে বিশ্রাম করছে।

দূরে কোথাও শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। মাঝি বলল, আবার বৃষ্টি নামতেছে। এই বছরের মত বৃষ্টি আর কোন বছর হয় নাই। শাহানার শীত শীত লাগছে। পায়ের কাছে ভাঁজ করা একটা চাদর আছে। কার না কার চাদর, গায়ে দিতে ইচ্ছা করে না। নিজের একটা চাদর থাকলে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকা যেত। বৃষ্টি নেমেছে জোরেসোরে। বিলের পানিতে বৃষ্টির শব্দ — কি যে অদ্ভুত! কি যে অদ্ভুত!!

ইরতাজুদ্দিন সাহেবের বাড়ির ঘাটে যখন নৌকা থামল তখন দু'বোনই ঘুমে অচেতন।

মতি ওদের ঘুম ভাঙাল না। ইরতাজুদ্দিন সাহেবকে খবর দিয়ে নিয়ে এল। সাত ব্যাটারির টর্চ হাতে তিনি নদীর ঘাটে এলেন। মেয়েদের মুখে টর্চের আলো ফেলে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

তিনি ব্যাকুল গলায় ডাকলেন — শাহানা, এই শাহানা!

শাহানা জাগল না। সে শুধু পাশ ফিরল।

২

পায়ের কাছে প্রকাণ্ড জানালা।

শহরের গ্রীলদেয়া জানালা না, খোলামেলা জানালা। এত প্রকাণ্ড জানালা যে মনে হয় আকাশটা জানালা গলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। ঘন নীল আকাশ, যেন কিছুক্ষণ আগে গাদাখানিক নীল রঙ আকাশে লাগানো হয়েছে। রঙ এখনও শুকায়নি। টাটকা রঙের গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে।

নীতুর ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ হল। সে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। নৌকায় ঘুমিয়ে পড়ার পর থেকে তার আর কিছু মনে নেই। কখন সে পৌঁছল, কে তাকে এনে বিশাল এই বিছানায় শুইয়ে দিল কিচ্ছু মনে আসছে না। এই তার সমস্যা — একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর ঘুম ভাঙতে চায় না। এখন ঘুম ভেঙেছে কিন্তু বিছানা থেকে নামতে ইচ্ছা করছে না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখছে।

বিছানায় পাশাপাশি দু'টা বালিশ। আপা আজ রাতে তার সঙ্গে ঘুমিয়েছে — এটা জেনে ভাল লাগছে। রাতে ঘুম ভেঙে সে যদি দেখত এতবড় বিছানায় একা শুয়ে আছে — অপরিচিত ঘর, চারদিকে সব অপরিচিত আসবাবপত্র, তাহলে ভয়েই মরে যেত।

পুরানো দিনের আসবাবপত্র সব এমন গাবদা ধরনের হয় কেন? খাট এত উঁচু যে গড়িয়ে পড়লে মাথা ফেটে ঘিলু বের হয়ে যাবে। নীতুর আবার খাট থেকে গড়িয়ে পড়ার অভ্যাস আছে। ভাগ্যিস সে দেয়ালের দিকে শুয়েছিল। ন্যাপথলিনের কড়া গন্ধে গা কেমন-কেমন করছে। পুরানো দিনের মানুষরা এত ন্যাপথলিন পছন্দ করে কেন? ওদের গা থেকেও ন্যাপথলিনের গন্ধ বের হয়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে নীতু আঁচ করতে চেষ্টা করল ক'টা বাজে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না — নীল আকাশ আর নীল আকাশে ধবধবে শাদা মেঘ। এমন শাদা মেঘ শুধু শরৎকালেই দেখা যায়। শ্রাবণ মাসের মেঘে কালো রঙ মাখানো থাকে। আল্লাহর স্টকে বোধহয় কলো রঙ শেষ হয়ে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ক'টা বাজছে নীতু বুঝতে পারছে না। বারান্দায় থপ থপ শব্দ হচ্ছে — মনে হয় চারপায়ে একটা প্রকাণ্ড ভালুক যেন হাঁটছে। ঘরে এসে যে দাঁড়াল সে ভালুকের মতই। এ বাড়ির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আসবাবের মতই প্রকাণ্ড একটা মানুষ — যার মাথার চুল শাদা। মনে

হচ্ছে শাদা রঙের সঙ্গে ম্যাচ করে তিনি শাদা একটা লুঙ্গি পরেছেন। খালি গা — গা ভর্তি ভালুকের পশমের মত শাদা লোম।

ভালুকটা মেঘের মত গর্জনে বলল, কি রে, এখনও ঘুমুচ্ছিস?

নীতু কিছু বলল না, চোখ পিট পিট করতে লাগল। ভালুকটা বলল, আরো ঘুমুবি? নাকি নাশতা-পানি করবি? তোর জন্যে আমিও না খেয়ে আছি। আমাকে চিনতে পারছিস? চেনার কথা না — একবারই শুধু দেখেছিস তোর যখন তিন বছর বয়স। এখন বয়স কত?

'বার।'

'হুঁ, ন' বছর আগের ঘটনা। মনে থাকার কথা না। তুই এত রোগা কেন? নিজে নিজে খাট থেকে নামতে পারবি না-কি কোলে করে নামিয়ে দেব?'

নীতু চট করে নেমে পড়ল। ভালুক টাইপ মানুষ হয়ত সত্যি সত্যি কোলে করে নামাতে আসবে।

'কোন্ ক্লাসে পড়িস?'

'ক্লাস সেভেন।'

'রোল নাম্বার কত?'

'পঁচিশ।'

'রোল পঁচিশ! তুই তো দেখি গাধা টাইপ মেয়ে। পড়াশোনা করিস না?'

'করি।'

'পড়াশোনা করলে রোল পঁচিশ কি করে হয়? বল দেখি তিন উনিশে কত?'

'ফিফটি সেভেন।'

'হয়েছে। এখন হাত-মুখ ধুয়ে খেতে আয় — সব গরম আছে . . . চাঁপের আটার রুটি আর ঝাল ঝাল ভুনা মুরগি। দুপুরে খাবি পাংগাস মাছ। খাস তো? শহরের মানুষ মাছ খাওয়া ভুলে গেছে . . .'

নীতু বলল, বাথরুম কোন দিকে?

'দূর আছে। শোবার ঘরের ভেতরে টাট্টিখানা এইসব ফোংরামি শহরে চলে, এখানে চলে না — আয় আমার সঙ্গে — কই, কদমবুসি না করেই রওনা হয়ে গেলি — মুরুব্বীদের সালামের ট্রেনিং বাবা-মা দেন না?'

নীতু লজ্জিত ভঙ্গিতে নিচু হল। কদমবুসির নিয়ম-কানুন সে ঠিক জানে না। দু'হাত দিয়ে দু'পা ছুঁতে হয় না-কি এক হাত দিয়ে? পা ছোঁয়ার পর হাতের আঙুলে চুমু খেতে হয়, না হাতের আঙুল মাথায় ছোঁয়াতে হয়? পা ক'বার ছুঁতে হয় — একবার না দু'বার? নীতুর মনে হচ্ছে — ছোটখাট কোন ভুল করলেই এই মানুষটা ধমক দেবেন। ধমক দেয়াই হয়ত তাঁর স্বভাব।

নীতু পুরোপুরি নিচু হবার আগেই ইরতাজুদ্দিন দু'হাতে তাকে ঝাপ্টে ধরে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলার ভঙ্গি করে আবার ধরে ফেলে বললেন — তোরা এসেছিস, আমি এত খুশি হয়েছি। রাতে তোরা ঘুমুচ্ছিলি, আমি তোদের খাটের মাথায় বসে বসে কেঁদেছি। জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর আমি মোট ক'বার কেঁদেছি জানিস? — চারবার। প্রথম তিনবার দুঃখে কাঁদলাম — শেষবার আনন্দে।

নীতু অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছে — মানুষটা তাকে কোলে করে আছেন। মনে হচ্ছে কোলে করেই বাথরুমে নিয়ে যাবেন। কি লজ্জা! আবার তার ভালও লাগছে। বড় হবার পর এত আদর করে কেউ কি তাকে কোলে নিয়েছে? না, কেউ কোলে নেয়নি। এই বুড়ো মানুষের গায়ে শক্তি তো অনেক। কি ভাবে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে আবার লুফে নিল . . .।

'নীতু তোর নাম?'

'হুঁ।'

'তুই দেখতে যেমন সুন্দর তোর নাম তত সুন্দর না। আমি তোর সুন্দর নাম দিয়ে দেব। এত আনন্দ হয়েছে তোদের দেখে — কেঁদে ফেলেছিলাম — এই জীবনে চারবার কাঁদলাম।'

'চারবার না — পাঁচবার। এখনও তো কাঁদছেন।'

'আরে তাই তো, এখনও তো চোখে পানি এসে গেছে। লক্ষ্য করিনি। নীতু, তোর তো অনেক বুদ্ধি। তোর বাবা ছিল অকাট গাধা — তার মেয়েগুলি এত বুদ্ধিমতী হবে ভাবাই যায় না।'

'বাবা মোটেই গাধা না।'

'বাবার সাফাই গাইতে হবে না। তোর বাবার বুদ্ধি কেমন তা তোরা আমার চেয়ে বেশি জানবি না।'

ইরতাজুদ্দিন সাহেব সত্যি সত্যি নীতুকে কোলে করে একেবারে বাথরুমের দরজায় নামিয়ে দিলেন। শুধু শুধু বাথরুমে গিয়ে নীতু করবে কি? তার টুথপেস্ট লাগবে, ব্রাস লাগবে . . . এই কথা মানুষটাকে বলতেও ইচ্ছা করছে না — বললে তিনি হয়ত আবার কোলে করে ঘরে নিয়ে যাবেন। এ তো দারুণ সমস্যায় পড়া গেল।

শাহানার সঙ্গে ইরতাজুদ্দিন সাহেবের এখনও কথা হয়নি। শাহানার ধারণা, দাদাজান সব কথা জমা করে রেখেছেন — নাশতার টেবিলে কথা হবে। তিনি নিশ্চয় জানতে চাইবেন — কেন তারা খোঁজখবর না দিয়ে হুট করে চলে এল। কেন কাউকে সঙ্গে আনল না। অথচ তিনি কিছুই জিজ্ঞেস করছেন না। সকালে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছেন, ঘুম ভাল হয়েছে? তাঁর সঙ্গে এই পর্যন্তই কথা। তার পর পরই তিনি ব্যস্ত

হয়ে পড়েছেন নাশতার আয়োজনে। শাহানা রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখে — বড় কড়াইয়ে কি যেন জ্বাল হচ্ছে। তিনি খুন্তি হাতে কড়াইয়ের পাশে। বৃদ্ধা একজন মহিলা লম্বা ঘোমটা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে — সে মনে হয় রাঁধুনী।

শাহানা বলল, দাদাজান, আপনি রান্না করছেন না-কি?

ইরতাজুদ্দিন হাসিমুখে বললেন — হুঁ। তোরা কি ঝাল বেশি খাস না কম খাস?

'মোটামুটি খাই।'

'মুরগির ঝোল ঝাল না হলে মজা নেই। ও রমিজের মা, দেখ, এই হচ্ছে আমার নাতনী। তুখোড় ছাত্রী, ডাক্তার। অসুখ-বিসুখ থাকলে চিকিৎসা করে নিও। এমবিবিএস পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। এখন আমেরিকায় জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ. ডি. করতে যাচ্ছে। কি রে শাহানা, ঠিক বলছি না?

'ঠিকই বলেছেন — এত কিছু জানেন কি ভাবে?'

'আমি সবই জানি। তোরাই আমার ব্যাপারে কিছু জানিস না। আমাকে সাপে কেটেছিল, তোরা জানিস?'

'না তো। বলেন কি?'

'দুর্বল ধরনের সাপ। বিষদাঁত ফুটিয়েও বিষ ঢালতে পারেনি, তার আগেই পা দিয়ে কচলে ভর্তা বানিয়ে ফেলেছি।'

'কি সর্বনাশ!'

'সাপের জন্যে সর্বনাশ, আমার জন্যে না। আমি তো ভালই আছি। রান্নাঘরের ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি কর, খিদেটা জমুক। চালের আটার রুটি খাস তো?'

'খাই।'

'পরোটা খেতে চাইলে পরোটা করে দেবে। খাবি পরোটা?'

'চালের আটার রুটিই ভাল।'

'রাঁধতে জানিস?'

'না।'

'রমিজের মা ট্রেনিং দিয়ে দিবে। তিন দিনে পাকা রাঁধুনি হবি। ডাক্তার মেয়েদেরও তো রেঁধে খেতে হবে।'

ধোঁয়ায় শাহানার কষ্ট হচ্ছিল। সে বারান্দায় চলে এল। বিশাল টানা বারান্দার পুরোটা কাঠের। ধুলো-ময়লা নেই — পরিষ্কার ঝকঝক করছে। কে পরিষ্কার করে এত বড় বাড়ি? রমিজের মা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাজের লোক এখনো শাহানার চোখে পড়েনি। তবে আছে নিশ্চয়ই — এত বড় বাড়িতে দু'জন মানুষ বাস করে — এটা

হতেই পারে না।

শাহানা বাড়ির চারদিক কৌতূহলী হয়ে দেখছে। জায়গাটা অদ্ভুতভাবে অন্যরকম। চারদিকে জেলখানার পাঁচিলের মত পাঁচিল। শ্যাওলা পড়ে ঘন সবুজ হয়ে আছে। পুরো বাড়িটা যেন সবুজ দেয়ালে ঘেরা। বাড়ির পেছনটায় গাছ–গাছালিতে জঙ্গল হয়ে আছে। আম এবং কাঁঠাল এই দুই ধরনের গাছ ছাড়া শাহানা আর কোন গাছ চিনতে পারছে না। একটা বোধহয় তেতুল গাছ — চিড়ল চিড়ল পাতা। তেতুল ছাড়া অন্য কোন গাছের পাতা কি এমন চিড়ল চিড়ল হয়? শাহানা জানে না। নিজের দেশের গাছপালা সে নিজে চিনে না — কি লজ্জার কথা! শাহানা ঠিক করে ফেলল, এই গ্রামের সব ক'টা গাছের নাম সে এবার জেনে যাবে। শুধু যে জানবে তাই না, খাতায় নোট করবে। গাছের বর্ণনা লেখা থাকবে, মোটামুটি ধরনের একটা ছবি আঁকবে এবং গাছের একটা করে পাতা স্কচ টেপ দিয়ে সাঁটা থাকবে। গাছগুলি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। বাগানে নামাটা ঠিক হবে কি না শাহানা বুঝতে পারছে না। হাঁটু সমান উঁচু ঘাস। ঘাস না থাকলে বাগানটা বেড়ানোর জন্যে সুন্দর হত। কাঁঠাল গাছের নিচু ডাল থেকে বড় একটা দোলনা ঝুলিয়ে দিলে সুন্দর হবে। ভরদুপুরে দোলনায় দোল খেতে খেতে বই পড়ার আনন্দই অন্য রকম।

নাশতার টেবিলেও ইরতাজুদ্দিন সাহেব কিছু বললেন না। শাহানা বলল, দাদাজান, আপনি কি আমাদের দু'জনকে আসতে দেখে অবাক হননি?

'না।'

'না কেন?'

'তোরা যে আসবি সেটা জানতাম।'

'কি ভাবে জানতেন?'

'স্বপ্নে দেখেছি।'

নীতু বিস্মিত হয়ে বলল — স্বপ্ন দেখেছেন?

'হুঁ। সোমবার শেষরাতে স্বপ্ন দেখলাম। তোরা দুইজন হাতে দুটা ভারী স্যুটকেস নিয়ে আসছিস। আমাকেই জিজ্ঞেস করছিস — ইরতাজুদ্দিন সাহেবের বাড়িটা কোথায়? — আমরা তাঁর নাতনী। আমি স্বপ্নের ভেতরই ভাবছি। আমার নাতনী তো তিনজন। আরেকজন এল না কেন? স্বপ্ন ভাঙতেই শুনি আজান হচ্ছে . . . তখনই বুঝেছি, তোরা আসছিস। লোকজন এনে ঘর-টর পরিষ্কার করালাম।'

শাহানা বলল, সত্যি বলছেন দাদাজান?

'হুঁ। তোদের সায়েন্স এসব স্বপ্ন স্বীকার করে না — তাই না?'

'স্বীকার–অস্বীকারের কিছু না। আপনার মনের মধ্যে ছিল যেন আমরা আসি। এ জন্যেই স্বপ্ন দেখেছেন। মনের ইচ্ছাগুলি স্বপ্নে চলে আসে। আপনি নিশ্চয়ই

মাঝে মধ্যে স্বপ্ন দেখেন — দাদীজান এসেছেন। দেখেন না?'

'দেখি।'

'দাদীজান কিন্তু আসেন না। মৃত মানুষ আসতে পারে না।'

'তোর বুদ্ধিও তো ভাল হয়েছে। বাবার মত গাধা হয়ে জন্মাসনি।'

'কথায় কথায় বাবাকে গাধা বলবেন না দাদাজান, আমার ভাল লাগে না।'

'যে গাধা তাকে গাধা বলায় দোষ হয় না।'

'দোষ হয়ত হয় না তবে গাধার মেয়েদের জন্যে মনোকষ্টের কারণ হয়। বিশেষ করে তারা যখন তাদের বাবাকে বুদ্ধিমান হিসেবে জানে।'

'তোরা তোর বাবাকে বুদ্ধিমান হিসেবে জানিস?'

'হুঁ।'

'কেন?'

শাহানা জবাব দেবার আগে নীতু বলল — আমরা বাবাকে খুব কাছ থেকে দেখছি বলেই জানি। আমার কাছে বরং আপনাকেই একটু বোকা বোকা লাগছে।

ইরতাজুদ্দিন নীতুর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে হাসি ঝলমল করতে লাগল। তবে মুখ গম্ভীর। নীতু বলল, আশা করি আপনি আমার কথায় রাগ করেননি।

'কি জন্যে আমাকে বোকা মনে হচ্ছে সেটা বল, তাহলে রাগ করব না।'

'আমাদের সামনে একটু পর পর বাবাকে গাধা বলছেন এই জন্যেই আপনাকে বোকা মনে হচ্ছে। কোন বুদ্ধিমান মানুষ এটা করবে না।'

ইরতাজুদ্দিন শব্দ করে হাসতে শুরু করলেন। হাসি বাড়তেই থাকল। নীতুর মনে হল, হাসির শব্দে ঘর-বাড়ি কাঁপতে শুরু করেছে। একটা মানুষ এতক্ষণ ধরে হাসতে পারে! নীতু বিস্মিত হয়ে তার বোনের দিকে তাকাচ্ছে . . .

ঘাট থেকে ধরাধরি করে একটা পাংগাস মাছ আনা হচ্ছে। মাছের দিকে তাকিয়ে নীতু হকচকিয়ে গেল। এতবড় মাছ। জীবন্ত। ছটফট করছে। ইরতাজুদ্দিন হাসি থামিয়ে বললেন — মাছটা লম্বা করে ধর। নীতু, যা মাছের পাশে গিয়ে দাঁড়া। দেখি কে লম্বা, তুই না মাছটা।

'মাছের সঙ্গে নিজেকে মাপতে ইচ্ছা করছে না দাদাজান।'

'দাঁড়াতে বললাম। দাঁড়া। আমি বোকা মানুষ, ফট করে রেগে যাব।'

নীতু মাছের পাশে দাঁড়াল। দেখা গেল, মাছটা তারচে' সামান্য বড়। ইরতাজুদ্দিন খুশি খুশি গলায় বললেন — এই মাছ খেয়ে আরাম পাবি। খাওয়ার শেষে দেখবি হাতে চর্বি জমে গেছে। সাবান দিয়ে চর্বি ধুতে হবে।

নীতু বলল — ভাবতেই আমার ঘেন্না লাগছে।

'ঘেন্না-টেন্না ভুলে যা। আমার রাজত্বে এসেছিস, আমার হুকুমমত চলতে হবে। আজ পাংগাস মাছ। কাল খাবি চিতল। হাওরের চিতল — এর স্বাদই অন্য। তোদের শহরের বরফ দেয়া এক মাসের বাসি চিতল না।'

শাহানা বলল, আমরা কিন্তু আগামীকাল চলে যাব। বাবাকে তাই বলে এসেছি। আমেরিকায় যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করার শখ ছিল, তাই এসেছি।

'তোরা কবে যাবি বা যাবি না সেটা আমি ঠিক করব। সব মিলিয়ে তোরা এখানে থাকবি দশদিন। এই দশদিন যেন আনন্দে থাকতে পারিস সেই ব্যবস্থা আমি করব।'

'সেটা তো দাদাজান সম্ভব না।'

'সবই সম্ভব। আমার রাজত্বে সম্ভব।'

নীতু বলল, বাবা ভয়ংকর চিন্তা করবে।

'চিন্তা করবে না, তাকে খবর পাঠিয়েছি।'

নীতু অসহায়ের মত তার আপার দিকে তাকাল।

ইরতাজুদ্দিন কঠিন গলায় বললেন — এই ভাবে তাকালে হবে না। তোরা ভুল করে আমার এলাকায় চলে এসেছিস। আমার এলাকা আমার হুকুমে চলে।

শাহানা বলল, আমরা তাহলে বন্দি!

'হ্যাঁ বন্দি। আগামী দশদিন আমার রাজত্বে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবি — রাজত্বের বাইরে পা ফেলতে পারবি না।'

'আপনার রাজত্ব কতদূর পর্যন্ত?'

'আপাতত সুখানপুকুর, নিন্দালিশ আর মধ্যনগর এই তিন গ্রাম। আমাদের পূর্বপুরুষরা এককালে এই তিন গ্রামের জমিদার ছিল।'

নীতু বলল, তিন গ্রামের মানুষদের অত্যাচার করে মেরেছে, তাই না?

'হ্যাঁ অত্যাচার করেছে। ভয়ংকর অত্যাচার করেছে। জমিদাররা কখনো প্রজাদের কোলে বসিয়ে আদর করে না। তাদের খাজনা আদায় করতে হয়। ডাণ্ডা বেড়ি ছাড়া খাজনা আদায় হয় না।'

নীতু ভীত মুখে বলল, এখন যদি গ্রামের মানুষরা আমাদের উপর সেই অত্যাচারের শোধ নেয় তখন কি হবে! ধরুন আমি একা একা বেড়াতে বের হয়েছি — ওরা ধরে আমাকে শক্ত মার লাগাল — তখনই ইরতাজুদ্দিন তাঁর বিখ্যাত হাসি আবার হাসতে শুরু করলেন — ঘর-বাড়ি কাঁপতে লাগল।

দ্রুতগামী একটা গাড়িকে হঠাৎ ব্রেক করে থামার মত তিনি হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেলে শাহানাকে বললেন — শাহানা, তুই আয় তো আমার সঙ্গে। তোকে একটা গোপন কথা জিজ্ঞেস করি।

শাহানা উঠে গেল। ইরতাজুদ্দিন তাকে বারান্দার এক কোণায় নিয়ে গেলেন।

গলা নিচু করে বললেন — তোর কি কোন পছন্দের ছেলে আছে?

শাহানা বিস্মিত হয়ে বলল, পছন্দের ছেলে মানে!

'পছন্দের ছেলে মানে — এমন কেউ যাকে খুব পছন্দ? যাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করিস, কফি হাউসে কফি খাস . . .'

'না আমার এমন কেউ নেই।'

'যদি থাকে তাকেও আসতে বলে চিঠি লিখে দে — আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব। ও এলে তোদের ভাল লাগবে। সঙ্গে নিয়ে ঘুরবি — দূর থেকে দেখে আমার ভাল লাগবে।'

'দাদাজান, আমার এমন কেউ নেই।'

'মহসীন নামের একটা ছেলের কথা তো জানতাম। ওকে কি এখন আর ভাল লাগে না?'

শাহানা বিস্মিত এবং কিছুটা হতভম্ব হয়ে বলল — দাদাজান, আপনি স্পাই লাগিয়ে রেখেছেন না-কি?

ইরতাজুদ্দিন হাসিমুখে বললেন — খবর দেবার লোক লাগিয়ে রেখেছি — করব কি — তোরা খবর দিবি না। গত সাত বছরে তোর বাবা কোন চিঠি লিখেনি।'

'আপনিও লিখেননি।'

'সে না লিখলে আমি কেন লিখব? আমার কিসের দায় পড়েছে? আমি কি তার খাই না তার পরি? যাই হোক, খবর পাঠাবি মহসীনকে?'

'না।'

'ও এলে তুই আনন্দে কাটাচ্ছিস দেখে আমার ভাল লাগত। নয়ত মুখ গোমড়া করে থাকবি . . . ।'

'মুখ গোমড়া করে থাকব না দাদাজান, যদি সত্যি দশ দিন থাকতে হয় — আমি থাকব। আনন্দেই থাকব।'

'ঐ ছেলের সঙ্গে এখনও ভাব আছে?'

'অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করুন তো।'

ইরতাজুদ্দিন সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি তাঁর নাতনীর গালে লালচে আভা দেখতে চাচ্ছেন। আজকালকার মেয়েরা লজ্জায় লাল হওয়া ভুলে গেছে। হয়ত এই মেয়েও ভুলে গেছে।

'কি ব্যাপার দাদাজান, আপনি এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?'

ইরতাজুদ্দিনের মুখে হাসি দেখা গেল। না, তাঁর নাতনী লজ্জায় পুরোপুরি লাল হওয়া ভুলে যায়নি। এই তো চোখে-মুখে রক্ত এসে গেছে। মাথা নিচু করে ফেলেছে। তিনি ঠিক করে ফেললেন — চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়ে দেবেন। ছেলে চলে আসুক।

এই বাড়িতেই বিয়ের উৎসব করা যেতে পারে। এ পরিবারের শেষ বিয়ে এখানেই হোক। তাঁর মৃত্যুর পর কে কোথায় যাবে বা যাবে না তাতে কিছু আসে যায় না।

'শাহানা !'

'জ্বি।'

'তোদের শোবার ঘরের টেবিলে চিঠি লেখার কাগজ–খাম সবই আছে। তোর চিঠি লেখার ইচ্ছা হলে লিখে ফেল — আমি লোক মারফত পাঠাব।'

'দাদাজান, আপনি অসহ্য একটা মানুষ। নীতু ঠিকই বলেছে — আপনি আসলেই খানিকটা বোকা।'

শাহানা রাগ করে চলে যাচ্ছে। ইরতাজুদ্দিন মনে মনে হাসছেন। তিনি তাঁর দুই নাতনীকে নিয়ে সোমবার ভোররাতে যে স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্নের শেষ অংশটি তাদের বলেননি। স্বপ্নের শেষ অংশে পরিষ্কার দেখলেন — শাহানার বিয়ে হচ্ছে এই বাড়িতে। বিয়ে উপলক্ষে তিন গ্রামের সবাইকে তিনি দাওয়াত করেছেন। বিয়ের খাওয়া হচ্ছে তিনদিন তিনরাত ধরে . . .।

দীর্ঘ দিন তাঁর এই প্রকাণ্ড বাড়ি খালি পড়ে আছে। নীরব নিস্তব্ধ পাষাণপুরী। ভূতের বাড়িতে এরচে' বেশি শব্দ হয়। কত রাতে ঘুম ভেঙে ইরতাজুদ্দিন শুনেছেন — বাড়ি কাঁদছে। জন–মানবহীন বাড়ি মানুষের সঙ্গের জন্যে কাঁদে। অল্প–বয়েসী কচি মেয়েদের গলায় বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।

আগামী দশদিন এই বাড়ি কাঁদবে না। বাড়ি জেগে ওঠবে। এরচে' আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। ইরতাজুদ্দিন ডাকলেন, নীতু, নীতু।

নীতু সামনে এসে দাঁড়াল।

'এক কাজ কর, বারান্দার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দৌড়ে যা।'

'কেন ?'

'শব্দ হোক।'

'শব্দ হোক মানে কি ?'

'কাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাবি, ধুপধাপ শব্দ হবে।'

'তাতে কি হবে ?'

'বাড়ি ঘুমিয়ে ছিল তো — বাড়ি জাগবে।'

নীতু হতভম্ব গলায় বলল, বাড়ি কি কোন জন্তু দাদাজান যে সে জাগবে, ঘুমিয়ে পড়বে ?

'বাড়ি জন্তু না হলেও বাড়ির প্রাণ আছে। যা, কথা বাড়াবি না, দৌড়ে এ–মাথা ও–মাথা কর।'

নীতু চোখ সরু করে তার দাদাজানের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কিছু বুঝতে পারছে না।

৩

সারারাত বৃষ্টিতে ভেজার ফল ফলেছে। মতি জ্বরে অর্ধ-চেতন। শীতে তার শরীর কাঁপছে। গায়ে পাতলা চাদর ছাড়া কিছু নেই। চাদরে শীত মানছে না। পানির তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। ঘরে পানিও নেই। কলসি ঠনঠন করছে। মতির মনে হচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা যাবে। জনমানবহীন এই বাড়িতে মতির বাস করা ঠিক না। মরে পড়ে থাকলেও তৎক্ষণাৎ কেউ কিছু জানবে না। শূন্য ঘরবাড়িতে মতির বাস করার কোন ইচ্ছা নেই, তাকে বাধ্য হয়ে থাকতে হচ্ছে। বাপ-দাদার ভিটা — মানুষ না থাকলে অকল্যাণ হয়। শূন্য ভিটায় পূর্বপুরুষরা হাঁটাহাঁটি করেন, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। মতি মাঝরাতে এই জাতীয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনেছে।

মতির বাড়ি এক সময় ছিমছাম সুন্দর ছিল। এখন ভগ্নদশা। দক্ষিণের ঘরের অর্ধেকটা গত কালবৈশাখীতে উড়ে গেছে। উড়ে যাওয়া অংশ খুঁজে পাওয়া গেলেও ঠিক করা হয়নি। বাংলোঘরও বাসের অযোগ্য। চালের খড় বদলানো হয়নি। পুরানো খড় পঁচে-গলে গেছে। মধ্যের ঘরটা কোন মতে ঠিক আছে। এই ঘরটা টিনের। মতির বাবা ইদরিছ মিয়ার মৃত্যুর আগে আগে ভীমরতির মত হল। ধানী জমি পুরোটা বিক্রি করে টিনের ঘর তুললেন। নেত্রকোনা থেকে কারিগর এনে ঘরের ভিটা পাকা করালেন। বাড়ির পিছনে টিউবওয়েল বসালেন। ছেলে বিয়ে-শাদী করবে। নতুন বউ এসে উঠবে টিনের ঘরে। পাকা ভিটিতে গরমকালে গা এলিয়ে শুবে। নিজের চাপকলে পানি তুলবে। পানির জন্য অন্য বাড়িতে যেতে হবে না। নতুন বৌয়ের তো একটা ইজ্জতের ব্যাপার আছে। বাপের দেশে গিয়ে বড় গলায় বলতে পারবে — স্বামীর বাড়িতে টিনের ঘর আছে। নিজেদের চাপকল আছে। এই কথা বলতেও কত আনন্দ। ইদরিছ মিয়া ছেলের বিয়ে না দিয়েই মরে গেলেন। গ্রামের মানুষ মতিকে ধরল — বাপের বেজায় শখ ছিল তোমার বিবাহ দিবে — এখন বিয়ে-শাদী করে সংসারধর্ম করো। সংসারধর্ম বড় ধর্ম।

মতি বিস্মিত হয়ে বলল, বৌরে আমি খাওয়ামু কি? সামান্য জমি যা ছিল বাপজান বেচে টিনের ঘর করল। পানির কল দিল। পানি খাইয়া তো মানুষ বাঁচে না।

'কাজকর্মের চেষ্টা দেখ।'

'কাজকর্ম জানি কি যে চেষ্টা দেখুম?'

অসুখ-বিসুখ হলে শুধু পুরানো কথা মনে হয়। বাপজানের কথা মনে হওয়ায় মতির মন হঠাৎ খানিকটা খারাপ হয়ে গেল। বড় দুঃখী ছিল মানুষটা — বেচারার

জন্যে যেন বেহেশত নসিব হয়।

জ্বরে মতির শরীর কাঁপছে। বিছানায় শুয়ে থাকলে জ্বর আরও বাড়বে। জ্বর এমন জিনিশ প্রশ্রয় পেলেই হু হু করে বাড়তে থাকে। ভালবাসা এবং জ্বর — এই দু' জিনিশ প্রশ্রয় পেলে বাড়ে। এই বিষয়ে একটা গান থাকলে ভাল হত। মতি গান বাঁধতে পারে না। গান বাঁধতে পারলে এটা নিয়ে সুন্দর গান বেঁধে ফেলত। তার মাথায় নানান বিষয় নিয়ে সুন্দর সুন্দর গান বাঁধার ইচ্ছে করে। ক্ষমতা নেই বলে বাঁধতে পারে না। আল্লাহ্‌পাক সবাইকে সব ক্ষমতা দেন না।

মতি বিছানা থেকে নামল। উঠানের জলচৌকিতে কিছুক্ষণ বসল। মাথা ঘুরছে— সামলে নিতে হবে। মাথা ঘুরে উঠানে পড়ে গেলে জ্বর ভাববে তার জিত হয়েছে, সে লাই পেয়ে মাথায় উঠে যাবে। তখন ডাক্তার আন রে, মাথায় পানি দাও রে . . .

পানির পিপাসায় বুক এখন ধড়ফড় করছে। ডাকলে যে কেউ আসবে সে উপায় নেই। তার ঘর পড়ে গেছে গ্রামের এক মাথায়। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটলে কুসুমদের বাড়ি। কোন মতে সেই বাড়িতে উপস্থিত হলে সেবা-যত্নের ত্রুটি হবে না। কুসুম তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। তবুও সে অসুস্থ মানুষটাকে ফেলে দেবে না। কুসুমের বাপ মোবারক চাচা তাকে স্নেহ করেন। গত ঈদে সূতীর একটা পাঞ্জাবি কিনে পাঠিয়ে দেন। পাঞ্জাবিটা গায়ে ছোট হয়েছে। সেটা কোন কথা না, একজন দিয়েছে আদর করে। আদরটাই বড়। কুসুমের বাড়ি যাওয়া কি ঠিক হবে? মেয়েছেলের কেটকেটানী কথা শুনতে কার ভাল লাগে? আর একটু এগুলেই মজিদের দোকানঘর। মজিদ নতুন মুদির দোকান দিয়েছে। দোকান চলছে না। নগদ পয়সা ছাড়া মজিদ কিছু বেচে না। কার ঠেকা পড়েছে নগদ পয়সায় সওদা করার? গ্রামের মানুষ দোকান করেছে — বাকিতে জিনিশ দেবে, ধানের সময় হিসেবমত ধান নিয়ে নেবে। মজিদ ধানের ধার ধারে না — তার না-কি নগদ ব্যবসা।

মজিদ দোকান খুলে একা একা চুপচাপ বসে থাকে। কাঁচের বৈয়ম ভরতি তালমিছরি। মাঝে মাঝে তালমিছরির টুকরা মুখে ফেলে দেয়।

মতি মজিদের দোকানের একপাশে শুয়ে থাকবে সাব্যস্ত করল। পথে কুসুমের বাড়িতে থামবে — পানি খেয়ে যাবে। কুসুমের বাবা অনেক দিন বাইরে, উনার কোন খোঁজ খবর আছে কি-না তাও জানা দরকার।

কুসুমের বয়স কুড়ি হয়েছে। এই বয়সে গ্রামের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় — কুসুমের হচ্ছে না। সম্বন্ধই আসছে না। কেন আসে না সেও এক রহস্য। তার গায়ের রঙ শ্যামলা — গরীব ঘরের বিয়েতে মেয়ের গায়ের রঙ তেমন প্রাধান্য পায় না। কুসুম দেখতে সুন্দর। চেহারার অতি কোমল ভাব অবশ্যি তার স্বভাবে নেই। তার জন্য কোন মেয়ের বিয়ে আটকে থাকে না। কুসুমের আটকে আছে। মনগড়ের পীর

সাহেবের হলুদ সুতা গলায় বাঁধার পরও সম্বন্ধ আসছে না। মনগড়ের পীর সাহেবের সুতা গলায় দেয়ার এক মাসের ভেতর সম্বন্ধ আসার কথা। সব সময় আসে।

মতিকে দেখে কুসুম চোখ কপালে তুলে বলল, আফনের হইছে কি?

মতি উদাস গলায় বলল, কিছু হয় নাই। পানি খাব।

'চউক করমচার মত লাল — হইছে কি? জ্বর?'

'না। পানি দেও দেখি।'

'পানি দিমু ক্যামনে? হাত বন্ধ দেহেন না?'

কুসুমের হাত ঠিকই বন্ধ। মাটি-গোবর মিশিয়ে মশলা বানাচ্ছে। ঘর লেপা হবে। কুসুমের পরনে সবুজ রঙের শাড়ি। মাথায় লম্বা চুল গাইনবেটিদের মত চুড়ো খোপা করা। সকালের রোদ পড়েছে তার চোখে-মুখে। কি সুন্দর তাকে লাগছে!

মতি বলল, পানির পিয়াস লাগছিল। ঘরে আর কেউ নাই?

'না?'

'আইচ্ছা তাইলে যাই।'

'বসেন। হাতের কাম শেষ করি — তারপর পানি দেই . . . '

'থাউক দরকার নাই।

'গোস্বা হইলেন?'

'না — গোস্বা হব কেন? গোস্বা হওয়ার মত তো কিছু বল নাই।'

'ভাব দেইখ্যা মনে হয় গোস্বা হইছেন।'

'ভাব দেইখ্যা কিছু বোঝা যায় না কুসুম। মানুষের অন্তরের ভাব বড়ই জটিল। সে নিজেই জানে না, অন্যে কি জানব।'

কুসুম মুখ টিপে হাসছে। মতি দুঃখিত গলায় বলল, হাস কেন?

'বড় বড় জ্ঞানের কথা শুইন্যা হাসি। ছাগল ব্যা কইরা ডাক দিলে ভালো লাগে, আদর করতে মন চায়। ছাগল যখন 'হালুম' ডাক দেয় তখন ভয় লাগে না — হাসি লাগে।'

খুবই অপমানসূচক কথা। মতি অপমান গায়ে মাখল না — প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, মোবারক চাচার খবর কিছু পাইছ?

'না।'

'চিডিপত্র?'

'উহুঁ।'

'বল কি! চিন্তার বিষয় হইল। যাই কুসুম, পরে খোঁজ নিব।'

মতি চলে যাচ্ছে। কেমন টলতে টলতে যাচ্ছে। কুসুমের খুব মায়া লাগছে। হাত বন্ধ থাকার জন্য সে যে পানি দিচ্ছিল না — তা না। কুসুম এই কথাটা বলেছিল যাতে

মতি কিছুক্ষণ বসে। পানি এনে দিলে তো পানি খেয়ে চলেই যাবে।

মেয়ে হয়ে জন্মানোর অনেক যন্ত্রণার একটা হল — মনের কথা বলা যায় না। মনের কথা বলার নিয়ম থাকলে অনেক আগেই কোন এক চান্নিপসর রাতে কুসুম উপস্থিত হত মতির বাড়িতে। মতি অবাক হয়ে দরজা খুললে হাসিমুখে বলত, তারপর অধিকারী সাব, আফনের সংবাদ কি?

মতি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকত — কুসুম বলত, কি সুন্দর চান্নিপসর দেখছেন? মতি আমতা আমতা করে বলত — তুমি অত রাইতে, বিষয় কি?

কুসুম বলত, আফনের ঐ গানটা শুননের খুব ইচ্ছা হইল — চইলা আসলাম।

'কোন্ গান?'

কুসুম তখন গুন গুন করে গাইত —

তুই যদি আমার হইতি
আমি হইতাম তোর।
কোলেতে বসাইয়া তোরে করিতাম আদর . . .

মতি অবাক হয়ে বলত — তোমার গলা তো বড় সৌন্দর্য কুসুম।

হ্যাঁ, কুসুমের গলা অনেক "সৌন্দর্য"। মতি সেটা জানে না। মেয়েছেলে হয়ে তো সে গানে টান দিতে পারে না। মেয়েছেলে গানে টান দিলে সাথে সাথে জ্বীনের আছর হয়। সংসারে অমঙ্গল হয়। পুরুষছেলে গানে টান দিলেই সংসার টিকে না — এই যে মতি ভাল ছিল, সুখে ছিল, যেই গানের টান দিল ওম্নি সব গেল। ঘর নাই, বাড়ি নাই, সংসার নাই।

কুসুমের প্রায়ই ইচ্ছা করে, যদি শুধু সে আর মতি মিলে একটা গানের দল দিত! আর কেউ না, শুধু তারা দু'জন।

কুসুমের মা মনোয়ারা ঘরের ভেতর থেকে ঝাঁঝালো গলায় ডাকলেন, কুসুম, ও কুসুম। কুসুম বিরক্ত মুখে উঠে গেল।

মনোয়ারা তিক্ত গলায় বললেন — ছেলেটা পানি চাইছে, তুই যে দিলি না!

'দেখ না হাত বন্ধ। পানি কি দিয়া দিমু? পাও দিয়া?'

'এটা কেমন কথা! পানি চাইছে — হাত ধুইয়া পানি দিবি। পানি চাইছে পানি পাইল না — এইটা কেমন কথা . . . সংসারে তুই অলক্ষণ ডাইক্যা আনতেছস।'

'আনতেছি ভাল করতেছি?'

'পুষ্প কই? পুষ্প!'

'পুষ্প কই আমি কি জানি। পুষ্প তো ছাগল না যে দেইখ্যা রাখব।'

'তোর কথাবার্তা এই রকম ক্যান?'

'আমি যেমন মানুষ — তেমন কথাবার্তা।'

'সামনে থাইক্যা যা কুসুম। যা কইলাম। তোরে দেখলে শইল জ্বলে।'

কুসুম বাড়ির পেছনের ডোবায় হাত ধুয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। মনোয়ারা পেছনে পেছনে ঢুকলেন। কুসুম তেলের শিশি হাতে নিচ্ছে।

'যাস কই?'

'তেল আনতে যাই।'

'তোর বাপ না তোরে ঘরের বাইর হইতে নিষেধ করছে!'

'ঘোমটা দিয়া যামু, ঘোমটা দিয়া আসমু। তেল ছাড়া রান্ধা হইব না।'

'না হইলে না হইব। খবর্দার, তুই ঘরের বাইর হবি না।'

কুসুম কিছু বলল না। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল সে যাবেই। মনোয়ারার ইচ্ছা করছে চুলের মুঠি ধরে মেয়েকে আছড়ে উঠানে ফেলে দিতে। সাহস হচ্ছে না। ভয়ংকর জেদী মেয়ে, কি করে বসবে কে জানে!

'তোর যে বিয়া হয় না — চালচলনের জন্যে হয় না। সম্বন্ধ আফনাআফনি আসে না — খোঁজখবর নিয়া আসে। তোর খোঁজখবর যা পায় . . .

কুসুম মা'র কথা শেষ করতে দিল না। তার আগেই বের হয়ে পড়ল। মজিদের দোকানে তেল আনতে যাচ্ছে। হাতের কাছে দোকান। আগেও অনেকবার গিয়েছে। মজিদ সম্পর্কে চাচাতো ভাই হয় — এমন কিছু ভয়ংকর অপরাধ কুসুম করছে না। তারপরেও মনোয়ারার গা জ্বলে যাচ্ছে। মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না এটা তাঁর কাছে সৌভাগ্যের মত মনে হচ্ছে। যে বিশ্রি স্বভাব কুসুমের হয়েছে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন কিছুদিনের মধ্যেই শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে।

কুসুম মজিদের দোকানে তেল আনতে যায়নি। সে মোটামুটি নিশ্চিত মতিকে দোকানেই পাবে। জ্বর যা এসেছে তাতে দোকানের একপাশে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকার কথা। পানি খেয়েছে কি-না কে জানে। জ্বরে পিয়াসের পানি না পেলে শরীর চড়ে যায়।

মতি দোকানে ছিল না। মজিদ একা তালমিছরি মুখে দিয়ে বিরস মুখে বসে আছে। কুসুমকে তার বেশ পছন্দ। বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে না, কারণ গরীব ঘরের মেয়ে, একে বিয়ে করলে কিছুই পাওয়া যাবে না। সৌন্দর্য দিয়ে কি হয় — দু'-তিনটা ছেলেপুলে হলেই সৌন্দর্য শেষ। সময়ের সঙ্গে সব নষ্ট হয়, শুধু টাকাপয়সা নষ্ট হয় না। টাকাপয়সা বাড়ে। তেলের শিশি এগিয়ে দিতে দিতে কুসুম বলল, মতি ভাইরে দেখছেন?

মজিদ সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, তেল কতখানি দিমু?

'তিন আঙ্গুল।'

'আঙ্গুলের হিসাব আমার দোকানে নাই। হয় এক ছটাক নাও, নয় এর কমে আধা ছটাক।'

'তিন আঙ্গুলে যতদূর হয় দেন — মতি ভাইরে দেহেন নাই?'

'দেখছি, পানি খাইতে আইছিল। আমি পানির মটকি নিয়া দোকানে বসছি? তেল দিলাম এক ছটাক। নগদ পয়সায় খরিদ করণ লাগব। টেকা আনছ।?'

কুসুম নিঃশব্দে শাড়ির আঁচল থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে দিল। কুসুমের মন খুবই খারাপ হয়েছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি দোকানের সামনে থেকে চলে যেতে পারে ততই মঙ্গল।

'মতি ভাই গেছে কোন্‌দিকে জানেন?'

'না। দোকান লইয়া কুল পাই না — কে কোন্‌দিকে গেছে অত খোঁজ ক্যামনে রাখব?'

'আফনের দোকানে তো মাছিও বসে না, অত বড় গলার কথা বেহুদা কন ক্যান?'

ঝাঁঝালো ধরনের কথা বলায় কুসুমের লাভ হয়েছে — ভেজা চোখ শুকিয়ে আসছে।

মজিদ বলল, তালমিছরি খাইবা?

'মাগনা দিলে খামু। দেন।'

মজিদ এক টুকরা তালমিছরি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ করল। অকারণে মিছরি খরচ হয়ে গেল। কোন দরকার ছিল না।

মতি ভাইয়ের একটা খোঁজ নিতে পারলে ভাল লাগত। কিভাবে খোঁজ পাওয়া যায়? পুষ্প সকাল থেকেই নেই — সে থাকলে তাকে পাঠানো যেত। এইসব কাজে পুষ্প খুব সেয়ানা . . .।

কুসুম ক্লান্ত পায়ে ফিরছে। মজিদের সঙ্গে ঝাঁঝালো ধরনের কথা বললেও বিশেষ লাভ হয়নি। কুসুমের চোখ আবার ভিজে আসছে। যা করতে চায় না সব সময় সে সেই কাজটাই কেন করে? সবসময় সে ঠিক করে রাখে, পরেরবার মতি ভাইয়ের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন খুব ভাল ব্যবহার করবে। এত ভাল যে মতি ভাইকে চিন্তায় পড়ে যেতে হয়। কখনো তা করা হয় না। সে সম্পূর্ণ উল্টোটা করে। কেন সে এরকম হল? কেন? পানি চেয়েছিল, দিয়ে দিলেই হত। পানির গ্লাস হাতে দিয়ে সে তো বলতে পারত — জ্বর নিয়া কই যাইবেন? বইস্যা যান। তাদের বাংলোঘর বলে কিছু নেই — বাংলোঘর থাকলে সেখানে বিছানা করে দিতে পারত। অসুস্থ মানুষ শুয়ে থাকত বিছানায়।

৪

বাবা,

তুমি আমার সালাম নিও। দাদাজান আমাকে দিয়ে জোর করে চিঠি লেখাচ্ছেন। তোমার কাছে নাকি ঐ চিঠি হাতে হাতে পৌঁছানো হবে।

আমরা সুখানপুকুর ঠিকমত পোঁছেছি। পথে কোন অসুবিধা হয়নি। শুধু ঠাকরোকোনা স্টেশনে পায়ে গোবর লেগে গিয়েছিল। তার কি যে কড়া গন্ধ! এখনও যাচ্ছে না। আমি এ বাড়ির বুয়াকে গরম পানি করতে বলেছি। গরম পানিতে আজ সারাদিন পা ডুবিয়ে রাখব।

এদিকে আমাদের খুব একটা খারাপ খবর আছে। ভয়ংকর খারাপ। দাদাজান বলছেন দশদিন থাকতে হবে। দশদিনের আগে তিনি আমাদের ছাড়বেন না। আপা হাল ছেড়ে দিয়েছে, আমি এখনও হাল ছাড়িনি। আমি খুব চেষ্টা করছি দাদাজানকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দুই-তিন দিন থেকে চলে আসতে। দাদাজান হয়ত বুঝতে চাইবেন না। কিছু কিছু মানুষ আছে — অন্যের সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে পারে না।

তবে জায়গাটা খুব সুন্দর। অবশ্য দশদিন ধরে দেখার মত সুন্দর না।

যদি দশদিন থাকতে হয় তাহলে আমি খুব বিপদে পড়ব। কারণ আমি মাত্র দু'দিন পড়ার জন্য গল্পের বই নিয়ে এসেছি।

বাবা শোন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমার যে বন্ধু আছে — মনীষা — তাকে টেলিফোন করে হ্যাপি বার্থডে দিতে হবে। তার জন্মদিন ১৭ তারিখ। তার টেলিফোন নাম্বার ৮১ ৩২ ১১।

চিঠি লেখার কাগজ শেষ হয়ে গেছে — চিঠি এখানেই শেষ করলাম। এবার তাহলে ৬০ + ২০

ইতি
নীতু

পুনশ্চ ঃ বাবা, তোমার বাবাকে আমার মোটামুটি পছন্দ হয়েছে। খুব বেশি পছন্দ হয়নি।

নীতু এক গামলা গরম পানিতে তার পা ডুবিয়ে রেখেছে। গোবরের গন্ধ দূর করার একটা চেষ্টা। তার হাতে গল্পের বই। সে খুব ধীরে ধীরে পড়ছে। তাড়াতাড়ি

পড়লেই বই শেষ হয়ে যাবে। মস্তবড় ভুল হয়েছে — অনেকগুলি বই নিয়ে আসা উচিত ছিল।

শাহানা বোনের কাণ্ড দেখল। তাকে মনে মনে স্বীকার করতেই হল নীতু খুব গোছানো মেয়ে। এর মধ্যেই গরম পানি গামলা সব জোগাড়যন্ত্র করে ফেলেছে। বেশ শান্ত শান্ত ভঙ্গি করে গল্পের বই নিয়ে বসেছে। যেন সে এ বাড়ির একজন কর্ত্রী। শাহানা বলল, ঘুরতে যাবি না-কি রে?

নীতু না-সূচক মাথা নাড়ল। বইয়ের পাতা থেকে চোখ সরাল না। শাহানা বলল, চল হেঁটে আসি — তুই তোর পায়ে আরও খানিকটা গোবর মাখার সুযোগ পেয়ে যাবি। স্টেশনের গোবরের মত বাসি গোবর না, টাটকা গোবর। এর মজাই অন্য রকম।

'আপা, বিরক্ত করবে না। প্লীজ।'

'গ্রাম দেখে আসি চল্।'

গ্রাম আমার দেখতে ভাল লাগে না। গ্রামের গল্প বই-এ পড়তে ভাল লাগে, দেখতে ভাল লাগে না।'

'বেশিক্ষণ পা পানিতে ডুবিয়ে রাখবি না। সমস্যা হবে।'

'কি সমস্যা হবে?'

'মাছের মত তোর পায়ে আঁশ বেরিয়ে যেতে পারে। শেষে দেখা যাবে মৎস্যকন্যা হয়ে গেছিস।'

'তুমি সব সময় ঠাট্টা কর আপা। মাঝে মাঝে ঠাট্টা ভাল লাগে না . . . '

'তুই যাবি না তাহলে?'

'না।'

শাহানা একাই বের হল। কেউ তাকে লক্ষ্য করল না।

শাহানার সবচে' বড় ভয় ছিল কাদার ভয়। দেখা গেল ভয় অমূলক। কাদা তেমন নেই। হাঁটার জন্যে কাদাবিহীন শুকনো জায়গা যথেষ্ট আছে। সাবধানে হাঁটলেই হয়। অস্বস্তির ব্যাপার একটাই — মাঝে মাঝে শাড়ি খানিকটা টেনে তুলতে হচ্ছে।

হাঁটতে শাহানার অসম্ভব ভাল লাগছে — ছায়াঢাকা পথ কথাটা বই-টইয়ে পাওয়া যায় — এই প্রথম সে ছায়াঢাকা পথ দেখল। বড় বড় ছাতিম গাছ সারা পথ জুড়ে এমনভাবে ছড়ানো যেন মাথার উপর ছাতা ধরার জন্যেই এরা আছে। পথের একদিকে বেতবন। শাহানা চিনতে পারল বেত ফল দেখে। থোকায় থোকায় ফলে আছে। কিছু বেতফল কি সে ছিঁড়ে নিয়ে নেবে? নীতু দেখলে মজা পেত।

পথে হাঁটতে হাঁটতে গ্রাম সম্পর্কে শাহানার ধারণা কিছু কিছু পাল্টাচ্ছে। যেমন

ঘুঘুপাখির ডাক। শাহানার ধারণা ছিল, ঘুঘুপাখি শুধু ভরদুপুরেই ডাকে। এখন দেখা যাচ্ছে তা না, এরা সারাক্ষণ ডাকে। পাখিরা মোটেই শান্ত এবং চুপচাপ ধরনের না — এরা বেশ ঝগড়াটে এবং সারাক্ষণ কিচির-মিচির করতে ভালবাসে।

শাহানা লক্ষ্য করল, বিভিন্ন বাড়ি থেকে মেয়েরা উঁকি-ঝুঁকি মেরে তাকে দেখছে। সে কোন পুরুষমানুষ না, মেয়েরা তাকে এমন আড়াল থেকে দেখছে কেন কে জানে। শাহানা তাকালেই এরা আবার দ্রুত সরে যাচ্ছে। পুরুষমানুষ তেমন চোখে পড়ছে না। সবাই বোধহয় কাজে চলে গেছে। শ্রাবণ মাসে হাওড় অঞ্চলের পুরুষদের তেমন কাজ থাকার কথা না — এরা গেছে কোথায়? ছোট ছোট ছেলেমেয়ে প্রচুর চোখে পড়ছে। এরা কেমন ভয়ে ভয়ে শাহানাকে দেখছে। তাকে এরা ভয় পাচ্ছে কেন? একটা ঐ দশ বছরের মেয়ে ভয় জয় করে শাহানার পেছনে পেছনে আসতে শুরু করেছিল। পেছন থেকে তার মা তাকে ডেকে থামিয়ে দিল।

পথটা এখন তিন ভাগে ভাগ হয়েছে। শাহানা দাঁড়িয়ে আছে। তিনপথের কোনটায় সে যাবে বুঝতে পারছে না। যদিও তিনটা পথই তার কাছে এক রকম। একটায় গেলেই হয়। সে নিরিবিলি কিছুক্ষণ হাঁটতে চায় — কাজেই এমন পথ তাকে বাছতে হবে যেখানে লোকজন কম চলাফেরা করে। সেটা বের করা তেমন কঠিন কিছু না, পথের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কোন্ পথে লোক চলাচল কম।

হারিয়ে যাবার ভয় নিশ্চয়ই নেই। এত ছোট জায়গায় কেউ হারায় না। আর যদি সে হারিয়ে যায়ও তাহলেও সমস্যা নেই। বললেই হবে — রাজবাড়িতে যাব। তাদের বাড়িটা হল রাজবাড়ি। সেই অর্থে রাজবাড়ির মেয়ে হয়ে সে হল রাজকন্যা। দি প্রিন্সেস।

রাজকন্যা একা একা হাঁটছে — প্রজারা সব দূর থেকে আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়ে দেখছে। মজার ব্যাপার তো। তার বেশভূষা ঠিক রাজকন্যার মত না। শাড়িটা আরও জমকালো হলে ভাল হত। সাদামাটা সুতির শাড়ি। গায়ে কোন গয়না নেই। রাজকন্যার থাকবে গা ভর্তি গয়না। জড়োয়া গয়না। আলো পড়ে পাথর চিকমিক করতে থাকবে।

শাহানা ভুল পথ বেছেছে। কিছুদূর গিয়েই পথ শেষ হয়ে গেল। ঘন জঙ্গল শুরু হল। জঙ্গলের ভেতর ঢোকার কোন প্রশ্ন ওঠে না। শ্রাবণ মাসের জঙ্গল — মাটিতে হাঁটু-উঁচু ঘাস জমে আছে — নিশ্চয়ই সাপখোপ কিলবিল করছে। বাঁ পাশে উঁচু ঢিবির মত আছে। তার বাঁধের ওপাশে হাওড়। শাহানা কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ফিরে যাবে, না বাঁধের ছোট পাহাড়টায় উঠবে?

আচ্ছা, এই সমতল ভূমিতে হঠাৎ এরকম উঁচু একটা জায়গার মানে কি? ডেবে যাওয়া পুরোনো কোন মঠ-টঠ না তো? আর্কিওলজী বিভাগ কি জানে এই জায়গা

সম্পর্কে? ঢিবির উপর উঠে দেখার মত কিছু কি আছে? না থাকারই কথা। তবু উঁচু জায়গা দেখলেই মানুষের উঠতে ইচ্ছে করে। শুধুমাত্র এই কারণেই শাহানা উঠা ঠিক করল। হিল পায়ে বাঁধে উঠা যাবে না। খালি পা হতে হবে। তার নীতুর মত শুচিবায়ু নেই, তবু পা থেকে জুতা খুলতে মন সায় দিচ্ছে না।

হঠাৎ পেছন থেকে তীক্ষ্ণ গলায় কে ডেকে উঠল — আপনে কে গো? আপনে কে?

হিল পায়েই শাহানা অনেকখানি উঠে পড়েছিল। সেইখানেই সে থামল। পেছন ফিরল। শ্যামলামত হালকা-পাতলা একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার চোখে গভীর কৌতূহল। মেয়েটার হাতে বাঁশের খলুই। আশ্চর্য মিষ্টি চেহারা তো মেয়েটির! মেয়েটা আগের মতই তীক্ষ্ণ গলায় বলল — নামেন কইলাম। নামেন। তাড়াতাড়ি নামেন।

'কেন?'

'সাপে ভর্তি। এইটার নাম — মা মনসার ভিটা। এক্ষণ নামেন।'

'তোমার নাম কি?'

'নাম পরে শুনবেন। আগে নামেন। প্রতি বছর এই জায়গায় সাপের কামড়ে গরুবাছুর মরে।'

'আমি তো গরুবাছুর না।'

'মানুষও মরে। গত বাইস্যা মাসে মরছে একজন।'

এতদূর ওঠে সাপের ভয়ে নেমে যাওয়া ঠিক না — আরো খানিকটা উঠা যাক। ঝাঁঝালো রোদে সাপ বের হয় না। তাদের চোখ আলো সহ্য করতে পারে না। শাহানা তর তর করে উপরে উঠে গেল। মেয়েটা হতভম্ব হয়ে তাকে দেখছে। ঢিবিটায় শেষ পর্যন্ত না উঠলে মেয়েটার হতভম্ব মূর্তি দেখা যেত না। বড় রকমের একটা মজা থেকে সে বঞ্চিত হত। শাহানা নেমে আসছে। নামাটা কঠিন মনে হচ্ছে। হিল খুলতেও সাহস হচ্ছে না। সাপের কথা বলে মেয়েটা ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

হিল না খুলেই শাহানা নামল। শাহানা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মেয়েটা বলল, আপনে কে?

সহজ সপ্রতিভ ভঙ্গি। গ্রামের মেয়েরা এমন আগবাড়িয়ে কথা কি বলে? বোধহয় না। দরজার আড়াল থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিতেই তারা পছন্দ করে।

'আমার নাম শাহানা। আমি ইরতাজুদ্দিন সাহেবের বড় নাতনী। তুমি কে?'

'আমি কেউ না।'

'কেউ না মানে কি? তোমার তো একটা নাম আছে। না-কি নামও নেই?'

'আমার নাম কুসুম।'

'খলুইতে কি?'

'গোবর। গোবর টুকাইতে বাইর হইছি। এর মধ্যে আপনেরে দেখলাম। আফনের বেজায় সাহস — মনসার ভিটাতে কেউ উঠে না।'

'শীতের সময়ও উঠে না? তখন তো সাপ থাকে না।'

'জ্বি না, শীতের সময়ও না।'

'এই জায়গাটা এমন উঁচু কেন জান?'

'আল্লাহ তাকে উঁচা কইরা বানাইছে, এই জন্যে উঁচা।'

শাহানা হেসে ফেলল। কুসুমও হাসছে। শাহানা বলল — গোবর দিয়ে কি করবে? সার বানাবে?'

'খড়ি করব।'

'এই বিশ্রি জিনিশটা হাতে মাখতে খারাপ লাগে না?'

'জ্বে না। খারাপ লাগবে ক্যান?'

শাহানা হাসিমুখে বলল, আমার একটা ছোট বোন আছে — ওর নাম নীতু। নীতুর পায়ে গোবর লেগেছিল। সে পুরো একটা সাবান পায়ে ঘষে শেষ করেছে। এখন গরম পানিতে পা ডুবিয়ে বসে আছে।

কুসুম বলল, আফনেরা রাজবাড়ির মেয়ে, আফনেরার কথা আলাদা।

'আমরা বুঝি রাজবাড়ির মেয়ে?'

'জ্বি।'

'রাজা থাকলে তবেই না রাজবাড়ি হয়। রাজা কোথায়?'

'রাজবাড়ি যার থাকে হেই রাজা।'

মেয়েটা শুধু যে সপ্রতিভ তাই না — লজিক নিয়ে খেলতেও পছন্দ করছে। বাহ্‌, বেশ তো। শাহানা বলল, তোমাদের বাড়ি কোনটা? কুসুম উৎসাহের সঙ্গে বলল — ঐ যে দেখা যায়। যাইবেন আমরার বাড়িত?

'হ্যাঁ যাব।'

'আফনেরে বুবু বললে আফনে কি রাগ হইবেন?'

'না, রাগ হব না।'

কুসুম উজ্জ্বল চোখে তাকাল। খুশি খুশি গলায় বলল, বুবু আসেন।

শাহানার যাওয়া হল না। সে অবাক হয়ে দেখল, তার দাদাজান প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছেন। এভাবে আসতে তাঁর যে কষ্ট হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে। তাঁর ফর্সা মুখ লাল টকটক করছে। তিনি খুব ঘামছেন।

ইরতাজুদ্দিনের পেছনে পেছনে দু'জন কামলাও আছে। একজনের হাতে ছাতা ধরা। তারাও হাঁপাচ্ছে। ইরতাজুদ্দিন থমথমে গলায় বললেন, আশ্চর্য কাণ্ড! তুই কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে এলি একা একা? আর কখনো যেন এরকম না হয়।

কখনো না।

তিনি পথের উপরই বসে পড়েছেন। বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছেন। শাহানার মনে হল, এই মানুষটার হার্টের কোন সমস্যা আছে। নয়ত ওভাবে পথের উপর বসে এত শব্দ করে শ্বাস নিতেন না। হার্ট বিশুদ্ধ রক্ত ঠিকমত সমস্ত শরীরে পৌঁছে দিতে পারছে না।

কুসুম পথ থেকে নেমে পড়েছে। ভীত ভঙ্গিতে ইরতাজুদ্দিন সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছে। ইরতাজুদ্দিন কড়া চোখে কুসুমের দিকে তাকালেন। কুসুম আরও সংকুচিত হয়ে পড়ল। তিনি নিজে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। শাহানার দিকে তাকিয়ে আবারও বললেন — আর কখনো এরকম করবি না। আয় আমার হাত ধর্। চল্ যাই।

৫

আকাশ দেখে কে বলবে কাল রাতে এত বর্ষণ হয়েছে? শাহানার চোখ বার বার আকাশে চলে যাচ্ছে। রোদ উঠেছে কড়া। বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ। শাহানা চায়ের কাপ-হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ বাড়ির সবই বড় বড়, শুধু চায়ের কাপগুলো ছোট। শাহানার অভ্যাস মগভর্তি চা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া। শুরুতে মগের চা গরম থাকে, আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকে। সেটা টের পাওয়া যায় না।

শাহানা শোবার ঘরে ঢুকল। নীতু গম্ভীর ভঙ্গিতে কি যেন লিখছে। নীতুর লেখালেখির সময় আশেপাশে না থাকাই ভাল। সে একটু পর পর বানান জিজ্ঞেস করবে। শাহানা আবার বারান্দায় চলে এল। বারান্দায় মাছ কাটা হচ্ছে। প্রকাণ্ড এক চিতল মাছ — তিনজন লাগছে মাছ কাটতে। দু'জন মাছ ধরে আছে, একজন বটি। প্রতিদিনই কি এমন সাইজের মাছ আনা হবে?

ইরতাজুদ্দিন বেতের মোড়ায় বসে আছেন। নাতনীর দিকে তাকিয়ে বললেন — আয়, মাছ কাটা দেখে যা।

জীবন্ত একটা প্রাণীকে কাটা হবে। সেই দৃশ্য পাশে দাঁড়িয়ে দেখার মধ্যে কোন আনন্দ নেই। দাদাজানকে এই কথা বুঝানোও যাবে না। শাহানা তাঁকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ইরতাজুদ্দিন এগিয়ে এলেন —

'চোখ বড় বড় করে কি দেখছিস?'

'বাড়ি দেখছি। কি প্রকাণ্ড বাড়ি! এত বড় বাড়ি বানানোর দরকার কি?'

'বাড়ি বড় না হলে মন বড় হয় না।'

শাহানা হাসতে হাসতে বলল, ঠিক বলেননি দাদাজান, এই পৃথিবীর বেশির ভাগ বড় মনের মানুষের জন্ম হয়েছে ছোট ছোট বাড়িতে। অন্ধকার খুপরিতে।

'ভুল তর্ক আমার সঙ্গে করবি না। রবীন্দ্রনাথ কি খুপরি ঘরে জন্মেছেন? টলস্টয় ছিলেন জমিদার। তুই দশটা বড় মনের মানুষের নাম বল যে খুপরি ঘরে জন্মেছে। খুপরি ঘরে থাকলে মনটাও খুপরির মত হয়ে যায়. . .'

শাহানা খুব চেষ্টা করছে দরিদ্র ঘরে জন্মানো কিছু ভুবন-বিখ্যাত মানুষের নাম মনে করতে, মনে পড়ছে না। অথচ সে জানে তার কথাই ঠিক। নামগুলি এক সময় মনে পড়বে, তখন কোন কাজে আসবে না।

ইরতাজুদ্দিন বললেন, বাড়ি পছন্দ হয়েছে কি না বল।

'হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে — ছাদে যাবার ব্যবস্থা থাকলে আরও পছন্দ হত।'

'ছাদে যেতে চাস? সেটা কোন ব্যাপারই না, মিস্ত্রি ডাকিয়ে সিঁড়ি বানিয়ে লাগিয়ে দেব।'

'দরকার নেই দাদাজান।'

ইরতাজুদ্দিন খুশি খুশি গলায় বললেন, অবশ্যই দরকার আছে। আমার বংশের একটা মেয়ে, তার শখ হয়েছে, সেই শখ মেটানো হবে না তা হয় না।

'এই বংশের মানুষদের সব শখ মেটানো হয়?'

'যতক্ষণ ক্ষমতা থাকে ততক্ষণ মেটানো হয়। আমার যে দাদাজান তার একবার শখ হল আম খাবেন। তখন মাঘ মাস — কোথায় পাওয়া যাবে আম? শখ বলে কথা — সেই আম জোগাড় করা হল — পাঞ্জাব থেকে আনা হল। সেই আমলে আম আনতে খরচ হয়েছিল সাত হাজার টাকা।'

'আম খেয়ে উনি খুশি হয়েছিলেন?'

'অবশ্যই হয়েছিলেন। শখ মেটাতে পেরেছেন এটাই খুশির ব্যাপার।'

'উনি কি উনার সব শখ মিটিয়ে যেতে পেরেছিলেন?'

'তা জানি না।'

'আপনি কি আপনার সব শখ মেটাতে পেরেছেন?'

ইরতাজুদ্দিন জবাব দিলেন না। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। শাহানা বলল, দাদাজান, মতি বলে যে ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে রাতে আমাদের সঙ্গে খেতে বলুন তো।

ইরতাজুদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, কেন?

'বেচারা খুব কষ্ট করে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন।'

'আপনি আপনি করছিস কেন?'

'আপনি বলব না?'

'অবশ্যই না। আপনি — তুমি — তুই এইগুলি সৃষ্টি হয়েছে কেন? প্রয়োজন আছে বলেই সৃষ্টি হয়েছে। ফকির যখন ঢাকায় তোদের বাসায় ভিক্ষা চায় তখন তুই কি বলিস — যাও মাফ কর, না-কি দয়া করে ক্ষমা করুন?'

'ফকির আমাদের বাসায় আসতে পারে না। দু'জন দারোয়ান, তিনটা এলসেশিয়ান কুকুর ডিঙিয়ে আসা সম্ভব না। অবশ্যি গাড়ি করে যাবার সময় মাঝে মাঝে ভিক্ষা চায় — তখন কিন্তু আমি আপনি বলি — তুমি বলি না, তুই বলি না।'

'এখানে বলতে হবে। আজ তুই মতি গাধাটাকে আপনি বলবি, সে লাই পেয়ে

যাবে, ভাববে . . . সমানে সমান।'

'দাদাজান আপনি পুরানো দিনের জমিদারদের মত কথা বলছেন। একটা মানুষ গরীব হলেই তাকে তুই বলতে হবে?'

ইরতাজুদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন — তোদের বয়সে এইসব আদর্শবাদী কথা বলতে ভাল লাগে। শুনতেও ভাল লাগে। এই বয়সে মনে হয় মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। ভেদাভেদ অবশ্যই আছে। তোর কাছেও আছে। মতি হল এই গ্রামের অপদার্থ একজন বাউন্ডেলে। কাজকর্ম কিছুই করে না — ঘুরে বেড়ায় — জ্ঞানীর মত কথা বলার চেষ্টা করে। গানের দল করেছে — দলের কাজ হল রাত জেগে হুল্লোড় করা — সব ক'টা চোর একত্র হয়ে . . .

শাহানা অবাক হয়ে বলল, এই ভাবে কথা বলছেন কেন? তাকে পছন্দ করেন না — ভাল কথা — চোর বলার দরকার কি?

ইরতাজুদ্দিন কিছুক্ষণ কড়া চোখে নাতনীর দিকে তাকিয়ে বাংলোঘরের দিকে রওনা হলেন। ছাদে ওঠার সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।

কাঠের সিঁড়ি সন্ধ্যা নাগাদ দাঁড়িয়ে গেল। সিঁড়ি খানিকটা নড়বড়ে। একজনকে সিঁড়ির গোড়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ইরতাজুদ্দিন কাঠ মিস্ত্রিকেই রেখে দিয়েছেন। দশদিন সে এ বাড়িতেই থাকবে, খাবে — তাঁর নাতনীরা যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠবে–নামবে সে সিঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। নড়বড়ে সিঁড়ি বানানোর এই তার শাস্তি।

শাহানার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে ইচ্ছা করল না। সে ছাদে হাঁটবে আর একজন সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করবে — কখন সে ছাদ থেকে নামবে — খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার। দরকার নেই তার ছাদে যাওয়ার।

শুরুতে নীতুর যত খারাপ লেগেছে এখন আর তত খারাপ লাগছে না। হারিকেন হাতে নিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে নীতুর ভাল লাগছে। হারিকেন তার খুব পছন্দ হয়েছে — হারিকেনে নিজের চারপাশটাই শুধু আলোকিত হয় আর সব অন্ধকার। নীতুর একা একা ঘুরতে খারাপ লাগত — এখন সে একা একা যাচ্ছে না। ইরতাজুদ্দিন নীতুর বয়েসী একটা মেয়েকে খবর দিয়ে এনেছেন — মেয়েটার নাম পুষ্প। তার কাজ হচ্ছে নীতুর সঙ্গে থাকা, তার ফুট–ফরমাস করে দেয়া।

পুষ্প শুরুতে খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। এখন তার ভয় কেটে গেছে। সে নীতুর সঙ্গে ছায়ার মত আছে তবে ফুট–ফরমাস করার কোন সুযোগ পাওয়া পাচ্ছে না। হারিকেনটা হাতে নিয়ে হাঁটলেও কিছু কাজ হত। নীতু হারিকেন হাতছাড়া করছে না। পুষ্পকে নীতুর খুব পছন্দ হয়েছে। শুধু মেয়েটা যদি একটু ফর্সা হত! মেয়েটা ভয়ংকর কালো। নীতু পুষ্পকে দেখে প্রথমেই বলেছে — তুমি এত কালো কেন?

পুষ্প তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছে — খালাম্মা, আমরা তো গরীব মানুষ এই জন্যে

কালো।

'গরীব মানুষ হলেই কালো হয়!'

'জ্বি খালাম্মা, হয়। বালা বালা সাবান না মাখলে কি আর শইল্যে রঙ ফুটে? গরীব মাইনষে সাবান কই পাইব!'

'শোন, আমাকে খালাম্মা ডাকছ কেন?'

'কি ডাকমু?'

'তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমাকে নীতু ডাকবে।'

'আফনে কি যে কন! ছিঃ, ছিঃ। থুক।'

পুষ্প থু করে একদলা থুথু ফেলল। নীতু রাগী গলায় বলল, ছিঃ ছিঃ বলে থুথু ফেললে কেন? ঘরের ভেতর থুথু ফেলা নোংরামি। থুথুতে ব্যাকটেরিয়া থাকে। ব্যাকটেরিয়া চারদিকে রোগ ছড়ায়। বুঝতে পারছ?

পুষ্প তেমন কিছু বুঝল না তারপরও বলল, পারতাছি।

তুমি অনেক কিছুই জান না। আমার কাছ থেকে শিখে নিবে। গরীব হলে গায়ের রঙ কালো হয় না। আর যদি গায়ের রঙ কালো হয় সাবান মেখে কিছু হবে না। অনেক ধনী মানুষের কালো কালো মেয়ে আছে। আমার এক বান্ধবী আছে, তৃণা নাম — ও ভয়ংকর কালো। ওর সাবানের অভাব নেই।

'ভাল সাবান দিলে কাম হয়।'

'কোন সাবানেই কাজ হয় না। তুমি লেখাপড়া জান?'

'জ্বে না।'

'সে কি! সত্যি জান না?'

'জ্বে না।'

'আমরা তো এখানে আরো ন'দিন থাকব। এই ক'দিনে তোমাকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে দেব। আজ প্রথম দিনে পড়াব না। কাল বই-খাতা নিয়ে আসবে।'

'বই-খাতা কই পামু?'

'বই-খাতাও নেই? আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করব।'

পুষ্পকে নীতুর খুব পছন্দ হলেও মাঝে মাঝে মেয়েটার বোকামি ধরনের কথায় গা জ্বলে যেতে লাগল। যেমন — নীতু অন্দর বাড়ি থেকে বাংলোঘরে যাবে — পুষ্প বলল, একটু খাড়ান বুবু, চুল বাইন্দা দেই।

নীতু বলল, কেন?

'অহন সইন্ধাকাল তো। সইন্ধাকালে চুল বান্দা না থাকলে জীন-ভূতে ধরে।'

'চুল বাঁধা থাকলে ধরে না?'

'জ্বে না।

'কেন?'

'চুল খোলা থাকলে চুলের আগা বাইয়া এরা শইল্যে উঠে। চুলের আগা না ধরলে এরা উঠতে পারে না।'

'আজেবাজে কথা আমাকে কখনো বলবে না পুষ্প। আজেবাজে কথা শুনলে আমি খুব রাগ করি। ভূত-প্রেত বলে পৃথিবীতে কিছু নেই।'

'আফনেরার শহর-বন্দরে নাই। আমরার গেরামদেশে আছে।'

'কোথাও নেই। ভূত-প্রেত সব মানুষের বানানো।'

'তাইলে বুবু আফনেরে একটা গফ কই, শুইন্যা নিজেই বিবেচনা করেন — গত বছর বইস্যা মাসে . . . বাপজান গেছে হাটে। টেকা লইয়া গেছে। কুসুম বু'র জন্যে শাড়ি কিনব। কুসুম হইল আমার বুবুর নাম। আমরা তিন ভইন ছিলাম। মাইঝলা ভইন পানিত ডুব্যা মারা গেছে। হেইডাও জ্বীনের কারবার। আফনেরে পরে বলব। যেটা বলতেছিলাম — বুবুর জন্যে বাপজান শাড়ি কিনব। মুসুল্লীর হাট। নৌকা লইয়া গেছে। মুসুল্লীর হাট তো আফনের হাতের তালুর মইদ্যে না — মেলা দূর। ফিরতে দিরং হইছে। নৌকা বাইয়া একা আসতাছে, হঠাৎ শুনে কাশির শব্দ। কে জানি কাশে। নৌকার মইদ্যে লোক নাই জন নাই, কাশে কে? বাপজান চাইয়া দেখে — নৌকার ছইয়ের ভিতরে সুন্দরপানা একটা মাইয়া। পান খাইয়া ঠোঁট করছে লাল। পরনে আগুনের লাহান এক শাড়ি। পায়ে আলতা। বাপজান অবাক হইয়া বলল — আফনে কেডা?

মেয়েছেলেটা সুন্দর কইরা হাসল, তারপরে বলল, আমি কে তা দিয়া কি প্রয়োজন? তোমার নৌকা বাওনের কাম, তুমি নৌকা বাও।

বাপজানের মনে খুব ভয় হইল। সইন্ধাকালে কি বিপদ! তার আর হাত চলে না। নৌকার বইঠার ওজন মনে হয় তিন মন। মেয়েছেলেটা বাপজানেরে বলল — ও মাঝির পুত মাঝি, নৌকা বাওন তোমার কাম, তুমি নৌকা বাও। খবরদার, আমারে আড়ে আড়ে দেখবা না। তোমার পুটলির মধ্যে কি?

বাপজান বলল, শাড়ি। নয়া শাড়ি। কুসুমের জন্যে কিনছি। আমার বড় মাইয়া।

'তোমার মাইয়ার নয়া শাড়ি আমি অখন পরব। খবরদার, শাড়ি বদলানির সময় আড়ে আড়ে আমারে দেখবা না। দেখলে নিজেই ভয় পাইবা।'

এই বইল্যা সেই মাইয়া নিজের পরনের শাড়ি এক টানে খুইল্যা ফেলল। বাপজান দেখব না দেখব না ভাইব্যাও এক ফাঁকে তাকাইল। তার শইলের রক্ত ঠাণ্ডা অইয়া গেল।'

নীতু ভীতু গলায় বলল, উনার শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হল কেন?

পুষ্প ফিস ফিস করে বলল, কারণ বাপজান তাকাইয়া দেখে, এই মেয়েছেলের বুকে তিনটা দুধ। দেইখ্যাই বাপজান এক চিৎকার দিয়া ফিট পড়ছে। ফিট ভাঙলে দেহে — ঘাটে নৌকা, মেয়েছেলেটা নাই।

'তোমার বাপজান এই গল্প তোমাদের বলেছেন?'

'না, আমরারে বলে নাই। মা'রে বলছে — গেরামের লোকরে বলছে।'

'তোমরা বিশ্বাস করছ?'

'বিশ্বাস না করনের কি? বিলের মইধ্যে ডাকিনী মেয়েছেলে থাকে . . . এরারে কয় মায়া ডাকিনী।'

নীতু রাগী গলায় বলল, বিলের মধ্যে মাছ ছাড়া আর কিছু থাকে না। তোমার বাপজান বানিয়ে বানিয়ে এই গল্প করেছেন। কারণ তোমার বুবু'র শাড়ি কেনার কথা ছিল তো। তিনি শাড়ি না কিনে টাকাটা অন্য কোথাও খরচ করে ফেলেছেন কিংবা হারিয়ে ফেলেছেন। কাজেই তিনি একটা গল্প বানিয়েছেন। তোমরা বোকা তো, তোমরা বিশ্বাস করেছ।

পুষ্প হাসছে। খিলখিল করে হাসছে। নীতু বলল, হাসছ কেন?

'বাপজান কিন্তুক বুবুর শাড়ি আনছে। ঐ মেয়েছেলে শাড়ি থুইয়া গেছে। যেমন ভাঁজ ছিল তেমন ভাঁজে ভাঁজে রাইখ্যা গেছে। তয় বুবু এই শাড়ি পিন্দে না। মা কয় — জ্বীন-ভূতের পরা শাড়ি শইল্যে দিস না। শাড়ি ঘরে তোলা আছে — লাল শাড়ি — আফনেরে দেখামু নে।'

নীতু ধাঁধায় পড়ে গেল। তার ভয় ভয়ও করতে লাগল। পুষ্প গলার স্বর নামিয়ে বলল — গেরামদেশ হইল বুবু জ্বীন-ভূতের দেশ। আমার মাইঝলা ভইনরে ক্যামনে পানিত ডুবাইয়া মারছে এইটা শুনেন . . . জ্বীনে ধরল . . . মাঘ মাসের শীত। জব্বর শীত পড়ছে . . .

নীতু বলল, জ্বীন-ভূতের গল্প আর শুনব না।

শাহানা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার দেখছে। শহরে অন্ধকার দেখার সুযোগ নেই। এখন আবার পথে পথে সোডিয়াম ল্যাম্প। রাত হলেই মনে হয় শহরটার জণ্ডিস হয়েছে। অন্ধকারও যে দেখতে ভাল লাগে তা এখানে এসেই শাহানা বুঝতে পারছে। দেখতে ভাল লাগার প্রধান কারণ বোধহয় গ্রাম কখনো পুরোপুরি অন্ধকার হয় না। ঐ তো জোনাকি পোকা জ্বলছে, নিভছে। কি অদ্ভুত সুন্দর! জোনাকি পোকারা শহর পছন্দ করে না, কারণটা কি — শহরে প্রচুর আলো এই জন্যে? এরা শুধু অন্ধকার খুঁজে বেড়ায়।

'একা একা এখানে কি করছিস?'

'জোনাকি পোকা দেখছি। আপনি কোথায় ছিলেন?'

'এশার নামাজ পড়লাম — তুই কি নামাজ টামাজ পরিস, না তোর বাবার মত হয়েছিস?'

শাহানা হাসতে হাসতে বলল, বাবার মত হয়েছি।

'তোদের বাসায় কেউ নামাজ পড়ে না?'

'মা খুব পড়ে। তাহাজুদও পড়ে। এখন এক পীর সাহেবের মুরিদ হয়েছে। বাবা মা'কে নিয়ে খুব হাসাহাসি করেন।'

ইরতাজুদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন — হাসাহাসি করার কি আছে?

পীর সাহেব-টাহেব নিয়ে মা'র মাতামাতি দেখে হাসাহাসি করেন। ধর্ম বিষয়ে মজার মজার তর্ক তুলে মা'কে রাগিয়ে দেন। রেগে গেলে মা একেবারে নীতুর মত — কেঁদে-কেটে একাকার।

ইরতাজুদ্দিন আরো গম্ভীর হয়ে বললেন — ধর্ম বিষয়ে মজার তর্ক কি?

শাহানা হাসল। অন্ধকারে ইরতাজুদ্দিন তার হাসি দেখলেন না। শাহানা বলল — বাবা বলেন, আমাদের আল্লাহর অংক জ্ঞান তেমন সুবিধার ছিল না — অংকে তিনি সামান্য কাঁচা। সম্পত্তি ভাগের যে আইন কোরান শরীফে আছে সেখানে ভুল আছে। যে ভুল হযরত আলী পরে ঠিক করেছিলেন, যাকে বলে 'আউল'।

ইরতাজুদ্দিন রাগী গলায় বললেন — ফারায়েজী আইনে ভুল, এইসব তুই কি বলছিস?

'আমি কিছু বলছি না, বাবা বলছেন। ভুলটা কেমন আপনাকে বলি দাদাজান। যেমন ধরুন, এক লোকের বাবা আছে, মা আছে, দুই মেয়ে এবং স্ত্রী আছে। সে মারা গেল। ফারায়েজী আইনে তার সম্পত্তি কি ভাবে ভাগ হবে? মা পাবে $\frac{১}{৬}$, বাবা $\frac{১}{৬}$, দুই মেয়ে $\frac{২}{৩}$, স্ত্রী $\frac{১}{৮}$, এদের যোগ করলে হয় $\frac{২৭}{২৪}$, তা তো হতে পারে না।'

'তোর বাবা এখন কি এইসবই করে বেড়ায়? ভুল-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়? সে নিজেকে কি মনে করে — দি পারফেক্ট?'

'আপনি ব্যাপারটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছেন দাদাজান।'

'আমি অন্যদিকে নিচ্ছি না। আমি শুধু তোর বাবার স্পর্ধা ও সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। সে আমারও ভুল ধরে। তার কত বড় সাহস, সে আমাকে চিঠি লিখে — আপনি যে অন্যায় করেছেন তার অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত . . .। আমি তার জন্মদাতা পিতা, সে আমার ভুল ধরে আমাকে শাস্তি দিতে চায় . . . ,

ইরতাজুদ্দিন রাগে থর থর করে কাঁপছেন। শাহানা দারুণ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। জোনাকি পোকা এখনো জ্বলছে, নিভছে, কিন্তু তার আলো এখন আর দেখতে ভাল লাগছে না।

মতির জ্বর পুরোপুরি সারেনি। এম্নিতে ভাল, একটু হাঁটাহাঁটি করলেই মাথা ঘুরতে থাকে, গা গরম মনে হয়। সবচে' বড় সমস্যা হল গলা বসে গেছে। গলা দিয়ে হাসের মত ফ্যাসফ্যাস আওয়াজ বের হচ্ছে। ইরতাজুদ্দিন সাহেবের নাতনীকে গান শুনাবার কথা ছিল। গলা না সারলে কিছু করার নেই। পরাণ ঢুলীর ঢোলটা আগেভাগে শুনিয়ে দেয়া যায়। শুধু ঢোল ভাল লাগবে না, ঢোলের সঙ্গে সঙ্গত করার কোন কিছু নেই। বেহালা সে বাজাতে পারে। পরাণের সঙ্গে বাজানো সম্ভব না — তার হচ্ছে জোড়াতালির ব্যাপার। নিন্দালাইশের আবদুল করিমকে নিয়ে এলে সব সমস্যার সমাধান হয়। জ্বর-শরীরে যাবে কি ভাবে? তাও না হয় গেল — আবদুল করিমের টাকাপয়সার খুব খাই। আগে টাকা তারপর কথা। মাগনার কারবার নাই। অনুরোধ-উপরোধ যদি করা হোক — আবদুল করিম বলবে —

মাগনার কাম জলে যায়
পুটি মাছে গিল্যা খায়
মাফ কইরা দিয়েন। বেহালার তার ছিঁড়া, জোড়া দেওনের ব্যবস্থা নাই।

একশ' টাকার একটা নোট হাতে ধরিয়ে দিলে অবশ্যি ছেঁড়া তার সাথে সাথে জোড়া লেগে যায়। সেই টাকা জোগাড় করাই সমস্যা। কোথায় সে পাবে একশ' টাকা?

তার নিজের হাত একেবারে খালি। ইরতাজুদ্দিন সাহেব তাঁর নাতনীকে নিয়ে আসার জন্যে তাকে খরচা বাবদ পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়েছেন। সম্বল বলতে এই। টাকাটা নিতে মতির খুবই লজ্জা লেগেছে। না নিয়েও পারেনি। গান-বাজনা বাবদ সে তো আর আগেভাগে টাকা চাইতে পারে না।

মতি নিন্দালাইশে যাওয়াই ঠিক করল। আবদুল করিমের দু'পা জড়িয়ে ধরলে যদি কিছু হয়। সম্ভাবনা নেই বললেই হয়, তারপরেও . . . কিছুই তো বলা যায় না। জগৎ চলে আল্লাহপাকের ইশারায়। আল্লাহপাক যদি ইশারা দিয়ে দেন আবদুল করিম চলে আসবে। তার গানের দলেও যোগ দিতে পারে। আবদুল করিমকে পাওয়া গেলে শক্ত একটা দল হয়।

উঠানে ঝাঁট দেয়ার শব্দ। কে ঝাঁট দেয়? মতি চাদর গায়ে বইরে এসে দেখে

কুসুম। গাছ কাপড়ে শাড়ি পরে প্রবল বেগে উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। মতি বিস্মিত হয়ে বলল, কর কি?

কুসুম বলল, কি করি দেখেন না? চউখ নাই — কানা?

বলেই কুসুমের মন খারাপ হয়ে গেল। কি বিশ্রি করেই না সে কথাগুলি বলল! অথচ আজ সে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে, যেভাবেই হোক একটা কাজ সে আজই করবে। সারা পৃথিবীর মানুষ তাকে বেহায়া বললেও করবে। তার গায়ে থু-থু দিলেও করবে। কাজটা হচ্ছে — সে মতির কাছে গিয়ে বলবে — এই যে অধিকারী সাব! আফনে গানের দল করছেন। দল নিয়া দেশে-বৈদেশে ঘুরবেন। আমি ঠিক করছি, আমিও আফনের দলের লগে যামু। দেশ-বৈদেশ ঘুরমু। আফনেরার রান্ধনেরও তো লোক দরকার। দরকার না?

খুবই মোটা ইংগিত। এই ইংগিত যে বুঝতে পারবে না সে মানুষ না — খাটাশ। মতি বোধহয় পারবে না। জগতে অনেক বুদ্ধিমান মানুষ আছে যারা প্রয়োজনের সময় খাটাশের মত হয়ে যায়। সে নিজে যেমন হয়েছে। কি কথা বলতে এসে কি বলছে।

মতি বলল, উঠান ঝাঁট দেওনের দরকার নাই কুসুম।

'দরকার নাই ক্যান? বাড়ি পতিত ফেলাইবেন?'

মতি কিছু বলল না। অকারণে খানিকক্ষণ কাশল।

কুসুম বলল, জ্বর কমছে?

'হ্যাঁ।'

'জ্বর কমছে তয় 'খেতা' শইল্যে দিয়া আছেন ক্যান?'

মতি জবাব দিল না। কুসুম বলল, কথা কন না ক্যান? জ্বরে জিবরা মোটা হইয়া গেছে? না কথা বলা বিস্মরণ হইছেন?

'তুমি রাগারাগি করতেছ কেন কুসুম? মিষ্টি গলায় কথা বলা তুমি জান না?'

'আফনের সঙ্গে আমি মিষ্টি গলায় কথা বলব ক্যান? আফনে আমার কে? আফনে কি আমার পীরিতের লোক?"

মতির মন খারাপ হয়ে গেল। এই মেয়েটা অকারণে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। এত সুন্দর একটা মেয়ে, অথচ কি বিশ্রি স্বভাব! শ্বশুরবাড়িতে মেয়েটা খুব কষ্টে পড়বে।

'জ্বর হইছে, ভিতরে গিয়া শুইয়া থাকেন। হা কইরা খাড়াইয়া আছেন ক্যান?'

মতি ঘরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের চোখে পানি এসে গেল। এটা সে কি করেছে? সে হাতের ঝাঁটা ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এখন সে কি করবে? চোখের পানি মুছে মতির ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সে কি বলবে — মতি ভাই, আফনেরে খুব একটা শরমের কথা বলতে আসছি। কথাটা হইল . . .

না, কথাটা আজ বলা যাবে না। কথাটা বলতে গেলেই সে কেঁদে-কেটে একটা

কাণ্ড করবে। সে সবাইকে তার চোখের পানি দেখাতে রাজি আছে, শুধু একজনকে না। মতি আবার বের হয়ে এসেছে। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। মতি বলল, কি হইছে কুসুম?

'কই কি হইছে?'

'কানতেছ কেন?'

'আমার পেটে হঠাৎ হঠাৎ একটা বেদনা হয়। তখন কান্দি।'

'কও কি? অসুখ হইছে, চিকিৎসা করবা না?'

কুসুম চোখ মুছতে মুছতে বলল, গরীবের এক অসুখ, তার আবার এক চিকিৎসা। গরীবের চিকিৎসা হইল কাফনের কাপড় দিয়া শইল ঢাকা।

'অসুখের কোন গরীব-ধনী নাই কুসুম। অসুখ সবের জন্যেই সমান। চান্দের আলো যেমন গরীব-ধনী সবের জন্যেই এক, অসুখ-বিসুখও . . . '

'চুপ করেন মতি ভাই। জ্ঞানের কথা কইয়েন না। চাঁন্দের আলো আর পেটের বেদনা দুইটা এক হইল?'

মতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, আসল কথা এইটা না কুসুম। আসল কথা হইল — কিছু কিছু সময় আছে যখন গরীব-ধনী এক হইয়া যায় — যেমন ধর, তুমি আর ইরতাজুদ্দিন সাহেবের বড় নাতনী। তোমরার দুইজনেরই হইল কলেরা। তখন কিন্তু দুইজনেই এক হইয়া গেলা।

'না, এক হব কেমনে? উনার চিকিৎসা হবে। দুনিয়ার বেবাক ডাক্তার ছুইটা আসবে। অষুধ, পথ্য, সেবা। আর আমারে ফালাইয়া থুইবে উঠানে।'

'তোমার এই পেটের বেদনা কি অনেক দিন ধইরা চলতেছে?'

'হাঁ।'

'খুব বেশি?'

'মাঝে মাঝে খুব বেশি। তখন ইচ্ছা করে কেরোসিন কিন্যা শাড়িত ঢাইল্যা আগুন দিয়া দি। তখন ঘরে কেরোসিন থাকে না বইল্যা আগুন দিতে পারি না। মাঝে মইধ্যে পানিতে ঝাঁপ দিয়া পড়তে ইচ্ছা করে। পানিতে ঝাঁপ দেই না — পানিতে ঝাঁপ দিলে মরণ হইব না — সাঁতার জানি।'

মতি বলল, ইরতাজুদ্দিন সাবের বড় নাতনী যে আছে — ইনারে তুমি একবার দেখাও। খুবই বড় ডাক্তার। ইরতাজুদ্দিন সাব বলছেন উনি ডাক্তারি স্কুল থাইক্যা সোনার একটা মেডেল পাইছে।

কথায় কথায় ইরতাজুদ্দিন সাবের নাতনী, ইরতাজুদ্দিন সাবের নাতনী বলতেছেন ক্যান? মেয়েটা খুব সুন্দর?

মতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, খুবই সুন্দর। চেহারা যেমন সুন্দর ব্যবহারও সুন্দর।

অতি মধুর ব্যবহার। অত বড়ঘরের মেয়ে ব্যবহারে বুঝনের কোন উপায় নাই। মনে হইব নিজেরার মানুষ। আমার কথা বিশ্বাস না হইলে একদিন নিজে গিয়া আলাপ কর — দেখবা কত খাঁটি কথা বলছি।

কুসুম তাকিয়ে আছে। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে সে মতির উত্তেজনা দেখছে।

'বুঝলা কুসুম — ইনারে গান শুনাইতে হবে। গানের একটা আসর করব। ভাবতেছি নিন্দালাইশের আবদুল করিম ভাইরে খবর দিয়া আনব। আমি, করিম ভাই, আমরার পরাণ কাকা — আরেকবার যদি পাইতাম ব্যাঞ্জো বাজানীর কেউ . . .'

'ব্যাঞ্জো বাজানীর লোক নাই?'

'উহুঁ।'

তাইলে তো আফনের বেজায় বিপদ।'

'করিম ভাই আইলে অবশ্য বিপদ কাটা যায়। একশ' টেকার কমে উনি আসব না। আমার কাছে আছে মোটে পঞ্চাশ . . .'

'উনার কাছে গিয়া চান।'

'কার কাছে চাব? ইরতাজুদ্দিন সাবের নাতনীর কাছে? ছিঃ ছিঃ! কি বল তুমি!'

কুসুম বলল — অখন যাই। বেলা হইছে। মতি বলল, আমি কি উনারে বলব তোমার চিকিৎসার কথা?

কুসুম কঠিন গলায় বলল, আগবাড়াইয়া মাতাব্বরি কইরেন না। আফনের কিছু বলনের দরকার নাই।

'হঠাৎ রাইগা গেলা কেন?'

কুসুম জবাব দিচ্ছে না — হন হন করে এগুচ্ছে। মতি বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে।

মনোয়ারা তাঁর বাড়ির উঠোনের জলচৌকিতে বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে আছেন। তাঁর শরীর এবং মন দুটাই খুব খারাপ। শরীর দীর্ঘদিন থেকেই খারাপ, এটা এখন আর ধর্তব্যের মধ্যে না। মন খারাপটাই এখন প্রধান। মন খারাপের কারণ — কুসুমের বাবার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এক মাসের উপর হয়ে গেল। এর মধ্যে কোন সংবাদ নেই, চিঠিপত্র নেই। নৌকা নিয়ে এর আগেও সে বের হয়েছে। একবার তো তিনমাস পার করে ফিরেছে। কিন্তু খবর পাঠিয়েছে। টাকাপয়সা পাঠিয়েছে। এবার কোন সাড়াশব্দই নেই।

রোজ রাতে শোবার সময় মনোয়ারার মনে হয় — মাঝরাতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কুসুমের বাবা বলবে — বৌ, উঠ দেখি। দরজা খুলে দেখা যাবে জিনিশপত্র নিয়ে

লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। এই এক স্বভাব মানুষটার। খালি হাতে কখনো আসবে না। টাকাপয়সা যা কামাবে, বলতে গেলে তার সবই খরচ করে আসবে। হাতের চুড়ি, আলতা, গন্ধ তেল, সাবান। এই সব জিনিশের চেয়ে নগদ টাকা অনেক বেশি দরকার। লোকটা তা বুঝে না। মনোয়ারাও কিছু বলেন না। শখ করে এনেছে, আনুক। রোজগারী মানুষের শখের একটা দাম আছে না? তাছাড়া মেয়ে দু'টি জিনিশ পেয়ে বড় খুশি হয়। কুসুম এত বড় ধামড়ি এক মেয়ে, সেও আলতা-সাবান-চিরুনী হাতে নিয়ে লাফ-ঝাঁফ দিতে থাকে। মনোয়ারা ধমক দেন — ঐ কুসুম, করস কি তুই? বাপের সামনে বেহায়ার মত লাফ দিতাছস। মোবারক তখন মৃদু গলায় বলে — "সব জিনিস দেখন নাই বৌ। দুই-একটা লাফ দিলে কিছু হয় না।" মনোয়ারার ধারণা, কুসুমের বাবা মেয়ে দু'টির লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি দেখার জন্যেই আজেবাজে জিনিশ কিনে পয়সা নষ্ট করে।

মনোয়ারার পিঠে রোদ এসে পড়েছে। রোদে গা জ্বলছে, কিন্তু জলচৌকি ছেড়ে উঠতে পর্যন্ত ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে তাঁর গায়ে উঠে দাঁড়াবার শক্তিটাও এখন আর নেই। মানুষটা কোন খবর পর্যন্ত দেবে না — এটা কেমন কথা? তিনি কুসুমকে পাঠিয়েছিলেন সেলিম্ বেপারীর কাছে। সে দেশে-বিদেশে ঘুরে — কুসুমের বাবার কোন খবর যদি পায়! কুসুম এখনো ফিরছে না। মনোয়ারার মন বলছে, কুসুম কোন একটা ভাল খবর নিয়ে আসবে। তিনি ঠিক করলেন, কুসুম না ফেরা পর্যন্ত তিনি রোদ থেকে উঠবেন না।

কুসুম ফিরেছে। মনোয়ারা অবাক হয়ে দেখলেন কুসুমের হাতে একটা ঝাঁটা। সে কি ঝাঁটা হাতে বেপারীর বাড়ি গিয়েছিল? তার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? মনোয়ারা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কুসুম, তুই বেপারী বাড়ি যাস নাই?

'না।'

'কই গেছিলি?'

'মতি ভাইরে দেখতে গেছিলাম।'

'কি জন্যে?'

'জ্বরে মানুষটা মইরা যাইতেছে, একটা চউখের দেখা দেখব না? এটা তুমি কেমন কথা কও মা?'

'তোর বাপের যে কোন খোঁজ নাই এইটা নিয়া তোর কোন মাথাব্যথা নাই। তুই কেমন মেয়ে রে কুসুম?'

'খারাপ মেয়ে।'

'মতিরে দেখতে গেলি ঝাড়ু হাতে?'

'হুঁ। উল্টা-পাল্টা কিছু কইলে ঝাড়ু দিয়া মাইর দিমু — এই ভাইব্যা ঝাড়ু নিয়া

গেছি।'

মনোয়ারা চুপ করে গেলেন। মেয়ের লক্ষণ ভাল বোধ হচ্ছে না। জ্বীনের আছর হচ্ছে কি-না কে জানে। মানোয়ারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, কুসুম আবার বেরুচ্ছে। মনোয়ারা গলার স্বর কোমল করে বললেন, কই যাস কুসুম?

'বেপারী বাড়িত যাই। বাপজানের খোঁজ লইয়া আসি।'

'থাউক, বাদ দে।'

কুসুম থামল না, হন হন করে বের হয়ে গেল। সে ঠিক করেছে বেপারী বাড়ি সে যাবে ঠিকই তবে যাবার আগে মতি ভাইয়ের বাড়ি হয়ে যাবে। হাসিমুখে দু'টা কথা বলে যাবে।

কুসুম মতিকে পেল না। মতি জ্বর গায়েই নিন্দালিশ চলে গেছে। আবদুল করিমের সঙ্গে কথা বলবে। তার মন বলছে আবদুল করিম বায়না ছাড়াই আসতে রাজি হবে।

আবদুল করিম খুব মন দিয়ে মতির কথা শুনল। মাঝখানে একবার শুধু বলল, আপনের গলাত কি হইছে, শব্দ বাইর হয় না? মতি বলেছে, ঠাণ্ডা।

'ও আচ্ছা, বলেন কি বলতেছেন।'

মতি যথাসম্ভব গুছিয়ে তার বক্তব্য বলল। গানের আসর সে করছে। ঢাকা শহরের বিশিষ্ট কিছু মানুষ গান শুনবে। সে যে গানের দল করেছে তার নাম ফাটবে। এই দলে আবদুল করিমের মত প্রতিভ না থাকলে কিভাবে হয়?

আবদুল করিম বলল, গানের দলের কথা বাদ দেন। আসর হইতেছে, তার বিষয়ে বলেন। বায়না কত?

'বায়না-টায়না নাই। খুশি হইয়া তারা যা দিব সবই আফনের। কথা দিলাম।'

'তারা খুশি হইব এইটা বলছে কে?'

'ভাল জিনিশে খুশি হয় না এমন মানুষ খোদার আলমে আছে?'

'গান-বাজনা ভাল জিনিশ আফনেরে বলছে কে? গান-বাজনা হইল শয়তানী বিদ্যা।'

'আইচ্ছা, সেটা যাই হোক — আফনের যাওন লাগব।'

আবদুল করিম উদাস গলায় বলল, মতি মিয়া —

মাগনার কাম জলে যায়
পুটি মাছে গিল্যা খায়
আফনে বাড়িত যান — আমার বেহালার তার ছিঁড়া।

মতি আরও কি বলতে যাচ্ছিল। আবদুল করিম তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। তবে অনাদর করল না। দুপুরে যত্ন করে ভাত খাওয়াল। তার ছোট মেয়ে ভাত-তরকারি এগিয়ে দিচ্ছিল, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল — ভাল কইরা যত্ন করবে ফুলি — ইনি মতি মিয়া। বয়স অল্প। অল্প হইলে কি হইব — গলা মারাত্মক। গানের দল করছে। যে-সে মানুষ না, দলের অধিকারী।

মতি ফুলির দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। ফুলি বলল, অধিকারী সাব, আমরারে গান শুনাইবেন না?

মতির জবাব দেবার আগেই আবদুল করিম প্রচণ্ড ধমক লাগাল — সম্মান রাইখ্যা কত বল ফুলি। আদবের সঙ্গে কথা বল। মুখের কথা বলতেই গানে টান দিব? বেয়াদব। গান অত সস্তা?

মতি অস্বস্তির সঙ্গে বলল, ছোট মানুষ।

'ছোট মানুষ বড় মানুষ কিছু না। আদবের বরখেলাপ আমার না-পছন্দ। গান-বাজনার বিদ্যা অতি কঠিন বিদ্যা। এর অসম্মান দেখলে আমার মাথাত আগুন জ্বলে।'

আবদুল করিমের বাড়িতে খাওয়ার আয়োজন অতি সাধারণ। কিন্তু বড় যত্ন করে খাওয়াল ফুলি। পর্দার আড়ালে থেকে সব লক্ষ্য করলেন ফুলির মা।

দুপুরে খাওয়ার পরপরই রওনা হওয়া গেল না। আবদুল করিম বিছানা করে দিয়েছে। পান-তামাকের ব্যবস্থা করেছে।

'পান-তামুক খাইয়া শুইয়া জিরান। শইলের যত্ন করেন। গান-বাজনা পরিশ্রমের ব্যাপার। পরিশ্রমের জন্যে শইল ঠিক রাখতে হয়। ঐ ফুলি, হাতপাখা লইয়া আয়। চাচারে বাতাস কর।'

'না না, বাতাস লাগব না। বাতাস লাগব না।'

'আফনে আমরার বাড়ির মেহমান। কি লাগব না লাগব সেইটা আমি বিবেচনা করব।'

আবদুল করিমকে আনতে না পারার দুঃখ মনে পুষে মতিকে ফিরতে হল। কোন রকমে শ'খানেক টাকার ব্যবস্থা করতে পারলে — একটা আসরে বসা যেত। কোথায় পাওয়া যায় শ'খানেক টাকা . . . !

৭

শহরের বাড়িগুলির সুন্দর সুন্দর নাম থাকে — দাদাজানের বাড়িটার কোন নাম নেই। একটা নাম থাকলে সুন্দর হত। শাহানা নীতুকে নিয়ে হাঁটছে আর মনে মনে এই প্রকাণ্ড বাড়িটার একটা নাম ভাবছে। কোন নামই পছন্দ হচ্ছে না — 'নিদমহল', 'সুখানপুকুর প্যালেস', 'কুঠিবাড়ি' . . . ইরতাজুদ্দিন সাহেব নাতনীদের একা একা দেয়ালের বাইরে যাবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তারা এখন একা নয়, দু'জন। কাজেই দেয়ালের বাইরে যেতে পারে। শাহানা ঠিক করেছে আজ সে দ্বীপের মত এই গ্রামটা পুরো চক্কর দেবে। তার সঙ্গে একটা খাতা ও কলম আছে। গাছের নাম লিখবে। গেটের কাছে এসে নীতু থমকে দাঁড়াল। সরু গলার বলল, কোথায় যাচ্ছ আপা?

শাহানা বলল, কোথাও না। হাঁটতে বের হয়েছি। হাঁটব।

'হাঁটবে কেন?'

'শরীর নামে আমাদের যে যন্ত্র আছে সেই যন্ত্র ঠিক রাখার জন্যে হাঁটাহাঁটির দরকার আছে।'

'আমার শরীর ঠিকই আছে। আমি হাঁটব না। তুমি যাও।'

'আয় তো নীতু, একা একা বেড়াতে ভাল লাগে না।'

নীতু বলল, পুষ্পকে সঙ্গে নিয়ে নি? তিনজনে বেড়াতে অনেক ভাল লাগবে।'

'না।'

নীতু বিরক্ত মুখে হাঁটছে। শাহানা বলল, দাদাজানের এই বাড়িটার জন্যে সুন্দর একটা নাম ভাব তো।

'পাষাণপুরী।'

'কাঠের বাড়ি, এর নাম পাষাণপুরী হবে কেন?'

নীতু বলল — পাষাণপুরী পছন্দ না হলে নাম রাখ কাষ্ঠপুরী।'

'আচ্ছা, আপাতত কাষ্ঠপুরী নাম থাকুক। তুই তোর মুখটা এমন পাষাণের মত করে রেখেছিস কেন?'

'তোমার সঙ্গে আমার বেড়াতে ভাল লাগছে না, এই জন্যে মুখটা পাষাণের মত করে রেখেছি।'

'পুষ্প মেয়েটা আসার পর থেকে তুই আমাকে এড়িয়ে চলছিস। তোর দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না। সারাক্ষণ পুষ্পকে নিয়ে ঘুরছিস। মেয়েটা কেমন?'

'ভাল।'

'বোকা না বুদ্ধিমতী?'

'মাঝে মাঝে মনে হয় খুব বুদ্ধিমতী, মাঝে মাঝে মনে হয় বোকা। বেশ বোকা।'

'সব বুদ্ধিমান মানুষকেই মাঝে মাঝে বোকা মনে হয়।'

'তুমি জ্ঞানের কথা বলো না তো আপা। তোমার জ্ঞানের কথা আমার অসহ্য লাগে।'

'পুষ্প কখনো তোকে জ্ঞানের কথা বলে না?'

'না।'

'ও গুটুর গুটুর করে তোর সঙ্গে কি গল্প করে বল তো শুনি?'

'ঐ গল্প তোমার ভাল লাগবে না।'

'তোর ভাল লাগে?'

'হুঁ।'

'তাহলে আমারও ভাল লাগতে পারে। ওর দু'-একটা গল্প বল শুনি।'

নীতু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উৎসাহের সঙ্গে বলল, পুষ্পের যে মেজো বোন তার নাম পদ্ম। একটা দুষ্ট জ্বীন পদ্মকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছিল।

শাহানা তীক্ষ্ণ চোখে বোনকে দেখছে। সে খুব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল, এরকম একটা অস্বাভাবিক গল্প নীতু বিশ্বাস করেছে। নীতু তো চট করে কিছু বিশ্বাস করার মেয়ে না। তার মানে পুষ্প মেয়েটা তার উপর ভালই প্রভাব ফেলেছে।

'ঐ জ্বীনটা কিন্তু এখনও ওদের বাড়িতেই থাকে। মাঝে মাঝে সে পুষ্পের বড় বোনের উপর ভর করে। পুষ্পের বড় বোনের নাম কুসুম।'

'তুই এইসব বিশ্বাস করছিস?'

'না।'

'তোর কথা বলার ভঙ্গি থেকে মনে হয় বিশ্বাস করছিস। গল্প শোনা এক কথা আর গল্প বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। চট করে কোন কিছু বিশ্বাস করতে নেই।'

নীতু কথা পাল্টানোর জন্যে বলল, আপা, আমরা কি কোন বিশেষ দিকে যাচ্ছি, না শুধু হাঁটছি?'

'বিশেষ দিকে যাচ্ছি। আমরা পুরো দীঘিটা চক্কর দেব। তারপর — মতি বলে যে ভদ্রলোক আমাদের পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে খুঁজে বের করব।'

'কেন?'

'আমাদেরকে উনার গান শুনাবার কথা। সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে।'

'তুমি কি তার বাড়ি চেন?'

'না। খুঁজে বের করব। জিজ্ঞেস করে করে উপস্থিত হব।'

'কাউকে তো জিজ্ঞেস করছ না।'

'করব, জিজ্ঞেস করব . . ।'

'উনার বাড়ি হল পুষ্পদের বাড়ির কাছে। পুষ্প উনাকে চেনে। পুষ্পকে সঙ্গে নিয়ে এলে চট করে বাড়িটা খুঁজে পাওয়া যেত।'

'পুষ্পকে না আনা তাহলে ভুল হয়েছে — তবে বাড়ি খুঁজে বের করতে খুব সমস্যা হয়ত হবে না। উনি গায়ক মানুষ — সবাই নিশ্চয়ই তাঁকে চেনে।'

নীতু বলল, পুষ্প উনার সম্পর্কে খুব অদ্ভুত একটা কথা বলেছে।

'কথাটা কি? তার সঙ্গেও একটা জ্বীন থাকে?'

'না।'

'তাহলে কি পরী থাকে?'

'ঐসব কিছু না, অন্য ব্যাপার। তোমাকে বলা যাবে না।'

শাহানা চিন্তিত বোধ করছে। পুষ্প মেয়েটা এমন কি কথা গোপনে বলা শুরু করেছে? যৌনতা-বিষয়ক কিছু না তো?

'নীতু।'

'হুঁ।'

'পুষ্প তোকে আজেবাজে কোন গল্প বলে না তো?'

'ওর সব গল্পই তো আজেবাজে। ও কি বলেছে জান? ও বলেছে, জ্বীনের দশটা করে ছেলেমেয়ে হয়। জ্বীনরা মারা যায় না। সব জ্বীন মারা যাবে কেয়ামতের দিন, তার আগে না।'

'পুষ্প মনে হচ্ছে জ্বীন বিশেষজ্ঞ।'

'জ্বীন সম্পর্কে সে অনেক কিছু জানে।'

'ওর সঙ্গে তোর মাখামাখিটা বেশি হচ্ছে নীতু।'

নীতু গম্ভীর মুখে বলল, তুমি দাদাজানের মত কথা বলছ আপা। ও গরীব বলে ওর সঙ্গে মাখামাখি করা যাবে না। ব্যাপারটা তো তাই? জাস্টিস ইমরান সাহেবের মেয়ে মৃদুলার সঙ্গে আমি যখন মাখামাখি করি তখন তোমরা কেউ কিছু বল না। ওকে ডেকে তুমি নিজেও হেসে হেসে অনেক কথা বল। পুষ্পের সঙ্গে এখন পর্যন্ত তুমি একটি কথাও বলনি।

শাহানা বলল, পুষ্পের সঙ্গে তোকে মাখামাখি কম করতে কেন বলছি জানিস? ও গ্রামের মেয়ে তো — ওদের কাছে পৃথিবীর কুৎসিত দিকগুলি আগে ধরা পড়ে। ঐসব নিয়ে গ্রামের মেয়েরা গল্প করতেও ভালবাসে। হয়ত জ্বীনের গল্প করতে

করতে এমন এক গল্প তোকে বলে ফেলবে যে গল্প শোনার মত মানসিক প্রস্তুতি তোর নেই।

'শহরের মেয়েরা এরকম কিছু করবে না?'

'না।'

নীতু গলার স্বর কঠিন করে বলল, মৃদুলা কিন্তু কুৎসিত কুৎসিত গল্প করে। ওর কাছে চারটা ভয়ংকর কুৎসিত ছবি আছে। ও লুকিয়ে রেখে দিয়েছে।

শাহানা স্তব্ধ হয়ে গেল। নীতু বলল, পুষ্পের একটা গল্প তোমাকে আমি বলতে রাজি হইনি আর তুমি ভাবলে সে আমাকে কুৎসিত কথা বলেছে। সে কি বলেছে জানতে চাও?

'না জানতে চাচ্ছি না। তুই এমন রেগে গেলি কেন?'

'তুমি 'সরি' বল, তাহলে আর রাগ করে থাকব না।'

শাহানা আন্তরিকভাবেই বলল, সরি। শুধু যে বলল তাই না — কৌতূহলী চোখে নীতুকে দেখল। এতদিনের চেনা নীতুকে আজ অচেনা লাগছে। এই অচেনা নীতু শান্ত সহজ কিন্তু ভয়ংকর তেজী।

'নীতু, তোর রাগ কি কমেছে?'

'হুঁ।'

'তাহলে বল দেখি এই গাছটার নাম কি?'

'এই গাছের নাম হচ্ছে আমলকি।'

'থ্যাৎ, তুই বানিয়ে বানিয়ে বলছিস।'

'বানিয়ে বানিয়ে বলব কেন, এটা হল আমলকি গাছ।'

'আর ঐ গাছগুলির নাম কি?'

নীতু গম্ভীর গলায় বলল — ইপিল ইপিল।

'যা মনে আসছে বলে ফেলছিস। ইপিল ইপিল গাছের নাম হয়?'

'হ্যাঁ হয়। তুমি যেমন অনেক কিছু জান যা আমি জানি না — আমিও তেমনি অনেক কিছু জানি যা তুমি জান না। যে কোন গাছের পাতা এনে দাও, আমি নাম বলে দেব।'

'শিখলি কোথায়?'

'আমি আর মিতু আপা প্রায়ই বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাই না? আমাদের কাজই তো হচ্ছে গাছের নাম মুখস্থ করা।'

'কেন?'

'এটা আমাদের একটা খেলা। আমি আর মিতু আপা দু'জনে মিলে খেলি — তবে মিতু আপা আমার সঙ্গে পারে না।'

শাহানা বলল, তুই সব গাছ চিনিস এটা যেমন বিশ্বাস করতে পারছি না আবার তেমনি অবিশ্বাসও করতে পারছি না — ঐ বড় বড় পাতাওয়ালা গাছটার কি নাম?

'কাঠবাদাম।'

'আচ্ছা দাঁড়া, স্থানীয় কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখি। ঐ বুড়োকে জিজ্ঞেস করব?'

'কর।'

বুড়ো মানুষটা শাহানাদের কেমন ভীত চোখে দেখছে। শাহনা ভেবে পেল না — তাদের দেখে ভয় পাবার কি আছে। সবাই তাদের ভয় পাচ্ছে কেন? শাহানা এগিয়ে গেল — হাসিমুখে বলল, আচ্ছা শুনুন, এই গাছটার নাম কি?

'আম্মা, এইটা হইল কাঠবাদাম গাছ। সাদা সাদা ফুল হয়। বড় সৌন্দর্য।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি কি গায়ক মতির বাড়িটা চেনেন?'

'আমরার মতি মিয়া?'

'হ্যাঁ, আপনাদের মতি মিয়া।'

'আইয়েন লইয়া যাই।'

'নিয়ে যেতে হবে না। আমাদের বলে দিন — আমরা যেতে পারব।'

বুড়ো মানুষটা তারপরেও সঙ্গে গেল। বাড়ির সামনে তাদের দাঁড়া করিয়ে তারপর গেল। এই কাজটি করতে মানুষটাকে খুব আনন্দিত মনে হল।

মতি ভাত চড়িয়েছে। উঠানের চুলায় রান্না হচ্ছে। চুলা ভেজা, প্রচুর ধোঁয়া হচ্ছে। আগুন বার বার নিভে যাচ্ছে। রান্না সামান্য — ভাত, ভাতের হাড়িতেই দু'টা আলু সেদ্ধ করতে দেয়া হয়েছে। ভাত — আলুভর্তা। সঙ্গে ডাল থাকলে জমিয়ে খাওয়া হত। ডাল ঘরে নেই। মতি চুলার পাশে বসে উঁচু মার্গের চিন্তা-ভাবনা করছে।

খিদে নামক একটা জটিল ব্যাপার দিয়ে আল্লাহপাক মানুষকে যে কি বিপদে ফেলেছেন এই নিয়েই সে এখন ভাবছে। খিদে নিয়ে জন্মগ্রহণ করা মানে পরাধীন হয়ে জন্মানো। খিদে না থাকলে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে মানুষ জন্মাত। আল্লাহপাকের মানুষকে পুরোপুরি স্বাধীন করার ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা থাকলে তিনি অবশ্যই একটা উপায় করতেন।

পায়ের শব্দে মতি পেছনে ফিরে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। শাহানা হাসিমুখে বলল, কি করছেন?

মতি জবাব দিতে পারল না। তার উঠে দাঁড়ানো উচিত, সে দাঁড়াতে ভুলে গেছে। শাহানা বলল, হুট করে আপনার বাড়ির ভেতর ঢুকে গেছি। রাগ করেননি তো ? অবশ্যি হুট করে ঢুকে পড়া ছাড়া উপায়ও নেই। গ্রামে তো আর কলিংবেল নেই যে প্রথমে বেল বাজাব।

মতি উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই-বা সে কি করবে? এদের কোথায় বসতে

দেবে? ঘরে কোন চেয়ার নেই। উঠানের এক মাথায় একটা জলচৌকি পড়ে আছে। বৃষ্টির কাদায় সেটা মাখামাখি।

শাহানা বলল, আপনি আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবেন না, বিব্রতও হবেন না। আমরা চলে যাব। আপনি বলেছিলেন গান শুনাবেন। তারপর তো আর আপনার কোন খোঁজ নেই। গানের ব্যবস্থা হচ্ছে?

'জ্বি জ্বি।'

'ও আচ্ছা। আমি ভাবলাম বোধ হয় ভুলে গেছেন।'

'জ্বি না, ভুলি নাই। আমার ইয়াদ আছে।'

'আমরা তাহলে যাই, আপনি রান্না করুন।'

মতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। জটিলতার উপর জটিলতা — সে আছে খালি গায়ে। নীতু বলল, আপনি কি রাঁধছেন?

'ভাত।'

'ভাত তো না। চাল রাঁধছেন। চাল ফুটে ভাত হবে। ভাতের সঙ্গে তরকারি কি?'

'আলু সিদ্ধ দিছি।'

'আলুসিদ্ধ আর ভাত? দু'টাই তো কার্বোহাইড্রেট — প্রোটিন কোথায়? মানুষের শরীরে প্রোটিন দরকার। তাই না আপা?'

মতি ক্ষীণ স্বরে বলল, মানুষের তো অনেক কিছুই দরকার। সব তো আর হয় না।

শাহানা বলল, আমরা যাচ্ছি, আপনি রান্না করুন। রান্নার মাঝখানে বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না।

শাহানা নীতুকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মতি আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। তার উচিত ছিল এগিয়ে দেয়া, তাও সে করল না। চূলা নিভে প্রচুর ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়ায় মতির চোখ জ্বালা করছে।

৮

পরাণ ঢুলীর বাড়িতে মতি বসে আছে। অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা ঠিকঠাক করা দরকার। একটু বাদ্য-বাজনাও হোক। মন উদাস লাগছে — বাদ্য-বাজনায় উদাস ভাবটা হয় কাটবে নয় আরও বাড়বে। দু'টাই ভাল। উদাস হলে পুরোপুরি উদাস হওয়া দরকার।

সাধারণত এই আসর বাড়ির দাওয়ায় মাদুরের উপর বসে। আজ বসেছে একটু দূরে, ছাতিম গাছের নিচে। পরাণের চোখে-মুখে রাজ্যের অনাগ্রহ। তার মন ভাল নেই, শরীরও ভাল নেই। সারা সকাল পেটের ব্যথায় ছটফট করেছে। দুপুরের পর ব্যথা কমেছে তবে শরীর ঝিম ধরে আছে। বিকালে শুরু হয়েছে অন্য যন্ত্রণা — তার স্ত্রী দূর্গার প্রসবব্যথা উঠেছে। এটা তেমন কিছু না — স্ত্রীলোক, বছরে-দু'বছরে প্রসবব্যথা হবেই। প্রথমে খানিকটা দুশ্চিন্তা থাকে — তারপর দুশ্চিন্তার কিছু থাকে না। দূর্গার এই নিয়ে সপ্তমবার। সন্তান প্রসব তার কাছে ডালভাতের মত হয়ে যাবার কথা। হয়েছেও তাই — এই অবস্থাতেও সে সংসারের টুকটাক কাজ সারছে। রাতের ভাত আগেভাগে রেঁধে ফেলেছে। মাষকলাইয়ের ডাল রান্না করা আছে। রাতে আর কিছু না রাঁধলেও হবে। ধাইকে খবর দেওয়ার জন্যে ছোট ছেলেটাকে পাঠিয়েছে। এই ছেলেটা খুব কাজের। সে যে শুধু খবর দেবে তাই না — যত রাতই হোক সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

পরাণের ছয় ছেলেমেয়ের মধ্যে চারটি বেঁচে আছে। ছেলে চারটাই বেঁচে। সংসারে মেয়ে নেই। দু'টি মেয়ের মধ্যে বড়টা কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদিন ধড়ফড় করতে করতে মারা গেল। ছোট মেয়েটা খুব সুন্দর হওয়ায় জন্মের পর পর খারাপ বাতাস লেগে গেল। আতুরঘরে খারাপ বাতাস লাগলে বাঁচানো মুশকিল — সুখানপুকুরে বড় গুণীন কেউ নেই। দূর্গার ধারণা, এবারের সন্তান মেয়ে হবে। দ্বিতীয় মেয়েটির মতই সুন্দর হবে। তা যদি হয় খারাপ বাতাস এবারও লাগবে। এই নিয়ে দূর্গার স্বামী পরাণের কোন মাথাব্যথা নেই। তাকে কিছু বলেও লাভ হবে না। যা করতে হয় নিজেরই করতে হবে। এক মুঠো সরিষা, লোহা, কাঁচা হলুদের এক টুকরা দূর্গা শাড়ির আঁচলে বেঁধে রেখেছে। এতে কাজ হবে না। আগের বারেও এইসব বাঁধা ছিল। ঘর বন্ধন দিতে পারলে কাজ হত। ঘর বন্ধন দিতে পারে এমন বড় হিন্দু গুণীন কেউ নেইও — তবে মুসলমান ফকিররাও ভাল ঘর বন্ধন পারেন। তাদের কাউকে

খবর দিলেও হয়। পরাণকে এইসব বলে লাভ হবে না। তাকে যা-ই বলা হোক সে উদাস গলায় বলবে — যাও বাদ দাও। সৃষ্টিছাড়া মানুষ — নয়ত আজকের দিনে কেউ বাদ্য-বাজনা নিয়ে বসে? সে কি আর জানে না আতুরঘরের পাশে বাদ্য-বাজনা করতে নেই? বাদ্য-বাজনার শব্দে খারাপ বাতাস বেশি আকৃষ্ট হয়।

"বাদ্য বাজে আতুরঘরে
পেরত বলে আরে আরে॥"

দূর্গা শক্ত পাটিতে শুয়ে আছে। তার মাথার নিচে তেল-চিটচিটে বালিশ। বালিশ না দিয়ে শোবার কথা, তবে এখনও দেরি আছে। ব্যথার ধাক্কাটা অনেক পরে পরে আসছে। মাঝরাতের আগে কিছু হবে না। ঘরে তেল নেই। সারারাত কুপি জ্বলবে — তেল লাগবে। ছেলেটা এলে তাকে তেলের জন্যে পাঠাবে। চারটা ছেলের মধ্যে একটাই কাছে আছে। সবগুলি পাশে থাকলে বুকে ভরসা পাওয়া যেত। ভাল-মন্দ কিছু ঘটে গেলে ওদের শেষদেখা দেখা যেত।

অন্ধকার ঘরে শুয়ে দূর্গার মন কেমন কেমন করতে লাগল। ভয় ভয় করতে লাগল। সন্তান জন্মের সময়টাতে সব মেয়েমানুষকে জীবন-মৃত্যুর সীমনায় এসে দাঁড়াতে হয়। তখন বড়ই ভয় লাগে। প্রাণ হাহাকার করতে থাকে। ইচ্ছা করে, প্রিয়জনরা সব ঘিরে বসে থাকুক, মাথা থাকুক স্বামীর কোলে। তা হবার নয়। জীবন-মৃত্যুর সীমারেখায় সব মেয়েকেই একা একা দাঁড়াতে হয়। দূর্গার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। ঢোলের বাড়ি বাড়ছে — আজকের বাজনাটা কি অন্য রকম? কেমন অদ্ভুত ট্যা টপ টপ ট্যা ট্যা টপ শব্দ।

পরাণ দশ মিনিটের মত বাজিয়ে ঢোল এক পাশে সরিয়ে রেখে বলল — মতি, যুইত লাগতাছে না।

মতি বলল, শরীর খারাপ না-কি?

'না শরীর ভাল। মনটা ভাল না। বাদ্য-বাজনা হইল মনের ব্যাপার। শইল ভাল-মন্দের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। আইজ থাউক।'

'থাকুক। থাকুক।'

'চা খাইবা? গুড়ের চা।'

'তা খাওয়া যায়।'

'দেখি, পাত্তি আছে না-কি দেখি . . .।'

পরাণ চায়ের কথা বলার জন্যে উঠে গেল।

ঘর অন্ধকার করে দূর্গা শুয়ে আছে। তেল যা আছে থাকুক — খরচ করা ঠিক হবে না। অন্ধকার ঘরের সুবিধাও আছে — চোখের পানি আড়াল করা যায়।

'এই, চা দেওন যাইব?'

দূর্গা নিঃশব্দে উঠে বসল। ব্যথার একটা প্রবল চাপ আসায় সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়তে হল। পরাণ বলল, থাউক বৌ, থাউক। শুইয়া থাক। দূর্গা বাধ্য মেয়ের মত আবারও শুয়ে পড়ল। মনে মনে বলল, আপনে একটু বসেন আমার কাছে। ঘরে এখন কেউ নাই। আপনার সাথে দুইটা সুখ-দুঃখের কথা বলি।

পরাণ বলল, কেমন বুঝতাছ বৌ?

দূর্গা সেই প্রশ্নের জবাব দিল না। সহজ গলায় বলল — চুলাত আগুন আছে — পানি বসাইয়া দেন। গুড় আছে ছিক্কার ভিতরে ডিব্বার মইধ্যে।

'আচ্ছা দেখি — তোমার তো অখনও দেরি আছে?'

'হুঁ।'

'কাউরে বলব আসার জন্যে?'

'না দরকার নাই।'

পরাণের বানানো গুড়ের চা ভাল হয়েছে। মতি আরাম করে চা খাচ্ছে। সে এবং পরাণ দু'জনই চুপচাপ বসে আছে। পরাণ কথা প্রায় কখনোই বলে না। তার সঙ্গে গল্প করতে এলে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকার পর পরাণ হঠাৎ দু'-একটা কথা বলে। মতির সেই সব কথা শুনতে ভাল লাগে। আজ পরাণ কোন দার্শনিক উক্তিও করছে না। মতি বলল, আইজ তাইলে উঠি কাকা?

'আচ্ছা।'

'উনারে বাজনা দিয়া মোহিত করা লাগব। মনে থাকে যেন।'

পরাণ হাই তুলল। উত্তর দিল না।

'তোমার ঘর অন্ধকার, ব্যাপার কি?'

পরাণ জবাব দিল না। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের জবাব দেবার অভ্যাস তার নেই।

'বাড়িতে কোন অসুবিধা নাই তো?'

'না।'

'কাকীর শইল কি ভাল?'

'হুঁ।'

মতি চলে যাবার পরও পরাণ অনেকক্ষণ একা একা বসে রইল। সুবল এখনও ফিরেনি। ধাই নিয়ে ফিরলে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করত। ধাইকে নতুন শাড়ি, দশটা টাকা আর এক কাঠা চাল দিতে হবে। শাড়ি কেনা আছে। গত হাটে কিনে এনে রেখে দিয়েছে। টাকা দশটা তার কাছে নেই। তবে দূর্গার কাছে অবশ্যই আছে। দুর্দিনের জন্যে সে টাকা আলাদা করে রাখে। বাড়িঘর এমন অন্ধকার করে রাখা ঠিক না। বিশেষ করে আতুরঘরে সার্বক্ষণিক বাতি রাখতে হয়। দূর্গা ঘর অন্ধকার করে রেখেছে কেন? প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। বিনা প্রয়োজনে দূর্গা কোনদিনও কিছু

করেনি।

পরাণ আবার ঘরে ঢুকল। মৃদু গলায় বলল — বাতি জ্বালাইয়া রাখ বৌ।

দূর্গা বলল, কেরোসিন কম আছে। সারারাত বাতি জ্বলব।

'আমি তেল কিন্যা আনি। বোতল কই?'

'সুবল আসুক। সুবল আনব। আপনে থাকেন। যাইয়েন না।'

পরাণ দূর্গার মাথার কাছে বসে আছে। দূর্গার ব্যথার চাপ এখন অনেক কম। সেও উঠে বসল। অন্ধকার ঘরে দু'জন নিঃশব্দে বসে আছে। এম্নিতেই দূর্গা প্রচুর কথা বলে কিন্তু এই মানুষটা আশেপাশে থাকলে চুপচাপ বসে থাকতে হয়।

দূর্গা বলল, পুলাপান দুইটারে খবর দিয়া আনেন।

'কেন?'

'অনেকদিন দেখি না, দেখনের ইচ্ছা করে।'

'আইচ্ছা, কাইল খবর দিব।'

দূর্গা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল — আমার মনের মধ্যে কু-ডাক ডাকতাছে। যদি ভাল-মন্দ কিছু হইয়া যায় — ক্ষমা দিবেন।

পরাণ এই কথার জবাব দিল না। হাঁ-হুঁ পর্যন্ত করল না। দূর্গা বলল, অভাব-অনটনে সংসার চালাতে গিয়া নানান সময়ে আপনেরে কটু কথা বলছি। মন থাইক্যা বলি নাই — মুখে চইল্যা আসছে, বলছি।

পরাণ বলল, তুমি যেমন বলছ আমিও বলছি।

'না, আপনে বলেন নাই। আপনি কোনদিনই কিছু বলেন নাই।'

'মুখে না বললেও মনে মনে হয়ত বলেছি।'

'না, মনে মনেও বলেন নাই। মানুষ যখন মনে মনে রাগ করে তখন তার চেহারা দেইখ্যা সেইটা বোঝা যায়। রাগ কইরা কত কটু কথা আপনেরে বলছি, তারপর অবাক হইয়া দেখছি আপনে মাথা নিচা কইরা হাসতাছেন। পুলাপানের মিটমিটাইন্যা হাসি। দেইখ্যা প্রত্যেকবার খুব শরম পাইছি। প্রত্যেকবার নিজেরে বলছি — দূর্গা, এমন একটা মানুষের সাথে তুই কটু কথা কস! তোর কি বিচার-বিবেচনা নাই?

পরাণ বলল, ঢোলটা বাইরে রইছে, নিয়া আসি। হঠাৎ বৃষ্টি নামলে ভিজব।

'ভিজুক। আপনে এইখানে বসেন। মন খুইল্যা দুইটা কথা কোনদিন আপনেরে বলতে পারি না — আইজ বলব।'

'বল।'

'কয়েকদিন থাইক্যা মনের মইধ্যে কু ডাকতাছে। ভাল-মন্দ যদি কিছু হয় . . .

'কিছু হবে না।'

'আপনে কি কইরা জানেন কিছু হবে না? আপনে মানুষটা দেবতার মত হইলেও

আপনে তো আর দেবতা না।'

দূর্গা কাঁদতে শুরু করেছে। আকাশে মেঘ ডাকছে। গুড়ু গুড়ু শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টি বোধহয় নামবে। বৃষ্টির মধ্যে যে শিশুর জন্ম হয় সে হয় ভাগ্যবান। পরাণের আগের কোন ছেলেমেয়ের জন্মের সময় বৃষ্টি ছিল না — এবারের জন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আসছে। পরাণ তার শরীরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করল।

ঝুম বৃষ্টির মধ্যে সুবল খোদেজার মা'কে নিয়ে এল। বহুদিনের অভিজ্ঞ ধাই। শিশু প্রসবের পুরো ব্যাপারটা নিশ্চিন্তে তার উপর ছেড়ে দেয়া যায়। ঘরে পা দিয়েই সে যা করার অতি দ্রুত করে ফেলবে। গরম পানি, নাড়ি কাটার জন্যে কঞ্চির ধারাল খণ্ড, সেঁক দেয়ার জন্যে কাপড়।

সূরা ইয়াসীন পড়ে রোগির পেটে ফুঁ দিয়ে সে কাজকর্ম শুরু করে। হিন্দু মেয়ের পেটে সূরা ইয়াসীন পড়ে ফুঁ দেয়া যায় কি-না এই নিয়ে তার মনে সংশয় ছিল। এখন সেই সংশয়ও নেই — মায়ের পেটের শিশু মুসলমান। ভূমিষ্ট হবার পর — হিন্দু-মুসলমানে ভাগাভাগি আসে। কাজেই পেটের সন্তানকে উদ্দেশ্য করে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা যায়।

খোদেজার মা চোখ বন্ধ করে সূরা ইয়াসীন পড়ে ফুঁ দিয়ে রাগী গলায় বলল, ব্যবস্থা তো কিছুই দেখি না। ঘর আন্ধাইর কইরা বইস্যা আছ। আন্ধাইর ঘরে জ্বীন-ভূত নাচানাচি করে। আলো না থাকলে ফিরিশতা আসে না। খালি কুপি দিয়া হইব না। হারিকেন লাগব। সেঁকের ব্যবস্থা লাগব। নরম তেনা কই? চা খাওনের একটু ব্যবস্থা দেখ। রাইত জাগন লাগব। ঘুমে চউখ আসতাছে বন্ধ হইয়া।

খোদেজার মা কোমরে শাড়ির আঁচল গুঁজে কাজে নেমে পড়ল। পরাণ এবং সুবল বসে রইল উঠোনে। সুবলের স্বভাবও তার বাবার মত — কথাবার্তা বলে না। সারাক্ষণই মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভোররাতে খোদেজার মা কুপি হাতে উঠোনে নেমে এসে বলল, অবস্থা ভাল না। বাচ্চার মাথা উপরের দিকে। দূর্গারে সদর হাসপাতালে নেওন লাগব। অতক্ষণ বাঁইচ্যা থাকব বইল্যা মনে হয় না। আমার জ্ঞান-বুদ্ধির মইধ্যে যা ছিল করছি। আল্লাহ পাক জানেন আর আমার নবিজী জানেন, আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

পরাণ হতভম্ব গলায় বলল, দূর্গা কি মারা যাইতাছে?

খোদেজা কিছু বলল না।

'সদরে নিয়া যাব?'

'সদরে নিতে দুইদিন লাগব। অত সময় আমরার হাতে নাই। তারপরেও চেষ্টা কইরা দেখন যায়। সদরে যদি যান — আমিও সাথে যাব।'

পরাণ উঠে দাঁড়াল। তার নিজের নৌকা আছে — সেই নৌকায় নেয়া যাবে না — ছই নাই। নৌকার জোগাড় দেখতে হবে। প্রথমেই খবর দিতে হবে মতিকে। মানুষের বিপদে-আপদে যে প্রথম ছুটে আসে সে মতি। সে পাশে থাকলে বুকে আপনাতেই হাতির বল চলে আসে।

টুপটাপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। পরাণ ছুটে যাচ্ছে। সুবল বৃষ্টির মধ্যে একা বসে আছে। খোদেজার মা বারান্দা থেকে ডাকল — এই ছেড়া, খামাখা বৃষ্টিতে ভিজতাছস ক্যান? যা, মা'র হাত ধইরা মা'র মাথার কাছে বইস্যা থাক।

সুবল নড়ল না। ভিজতে থাকল।

ফজরের নামাজ শেষ করে ইরতাজুদ্দিন বাংলোঘরে এসে দেখেন মতি বসে আছে। উদভ্রান্তের মত চেহারা — বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপ করছে। খালি পা, হাঁটু পর্যন্ত কাদা। ইরতাজুদ্দিনের ভুরু কুঞ্চিত হল — খালি পায়ে যে আসছে সে বাংলোঘরে ঢুকবে কেন? সে দাঁড়িয়ে থাকবে উঠোনে।

মতি বলল — বিরাট বিপদে পড়ে আপনের কাছে আসছি স্যার।

ইরতাজুদ্দিনের ভুরু আরও কুঞ্চিত হল। কি বিপদ আঁচ করতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

'বল কি ব্যাপার।'

'পরাণ কাকার স্ত্রীর সন্তান হবে . . .'

তাকে থামিয়ে দিয়ে ইরতাজুদ্দিন বললেন — সেটা তার বিপদ, তোমার কি? আমার কাছেই বা কেন?

'আপনার বড় নাতনী ডাক্তার . . .'

'সে ডাক্তার ঠিকই আছে — সে তো আর ধাই না যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাচ্চা প্রসব করাবে।'

'চাচা, কাকী মারা যাইতাছে — একজন ডাক্তার দরকার।'

'শোন মতি, তোমাকে একটা কথা বলি — আমার নাতনী ডাক্তার ঠিকই আছে — শেষ মুহূর্তের একটা রোগি দেখবে, তারপর রোগি যাবে মরে — এটা কি ভাল? লোকজনের ধারণা হবে, আমরা নাতনী খারাপ ডাক্তার। এটা তো আমি হতে দেব না। কিছুতেই না। মেয়েটা এসেছে বেড়াতে, অসুখ-বিসুখ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করার জন্য আসে নাই . . .।'

'একটা মানুষ মারা যাইতেছে।'

'কপালে মৃত্যু থাকলে মারা যাবেই। ডাক্তার গুলে খাওয়ালেও কিছু হবে না।'

'গ্রামের মানুষের আপনার নাতনীর উপর দাবি আছে স্যার। সেও তো এই

গ্রামেরই মেয়ে . . .'

ইরতাজুদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, যুক্তি-তর্ক শুরু করলা কেন? এটা তো যুক্তি-তর্কের বিষয় না।

'আমি উনারে নিজে একটু বইল্যা দেখি — উনি যদি যাইতে চান . . . কাকী বাঁচবো না আমি জানি। তবু মনের শান্তি। সে বুঝবো তাকে বাঁচানোর চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।'

'এটা বুঝে লাভ কি?'

মতি চুপ করে রইল। ইরতাজুদ্দিন বললেন — খামাখা দাঁড়িয়ে থাকবে না। চলে যাও। আর শোন — খালি পায়ে আমার বাংলোঘরে উঠবে না।

মতি তারপরেও দাঁড়িয়ে রইল। নড়ল না। ইরতাজুদ্দিন কঠিন গলায় বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

মতি বলল, আমি উনার সঙ্গে কথা না বইল্যা নড়ব না। উনার উপর আমার দাবি আছে।

'তার উপর তোমার দাবি আছে মানে? বর্বরের মত কি বলছ তুমি? কি করছ তুমি?'

মতি চুপ করে আছে। আসলেই তো, তার কিসের দাবি! বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে লগি ঠেলে সে এদের নিয়ে এসেছে। এতে খানিকটা দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় — কিন্তু তার জন্যে সে পারিশ্রমিক নিয়েছে। পঞ্চাশটা টাকা না নিলে দাবি থাকত। এখন নেই। মতি বলল, উনি যদি নিজের মুখে 'না' বলেন তাইলে আমি চইল্যা যাব।

'সে না বললে তুমি যাবে না?'

'না।'

'দাঁড়িয়ে থাকবে এখানে?'

'জ্বি।'

'তুমি যে এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাগল সেটা তুমি জান?'

'ছাগল হই আর না হই — আমি উনার সঙ্গে কথা না বইল্যা নড়ব না।'

ইরতাজুদ্দিন অনেক কষ্টে রাগ সামলে নাতনীকে আনতে গেলেন।

শাহানা শান্ত মুখে এসে দাঁড়াল। মতি বলল, বড় বিপদে পইর‍্যা আসছি। পরাণ কাকার স্ত্রী মরতে বসছে। সন্তান প্রসব হইতাছে না। আপনি কি তারে একটু চউখের দেখা দেখবেন?

শাহানা তার দাদাজানকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলল, অবশ্যই দেখব।

৯

মতি ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে। তার পেছনে পেছনে একজন মেয়ে যাচ্ছে — সে তার মত ছুটতে পারবে কি-না এদিকে তার খেয়াল নেই। শাহানা অবশ্যি মতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই ছুটছে। একবার শুধু সে আকাশ দেখল — আকাশ ঘন কালো। এরকম কালো আকাশ সচরাচর দেখা যায় না।

শাহানা বলল, রোগির অবস্থা কি খুব খারাপ?

মতি ঘাড় না ফিরিয়েই বলল, জ্বি! মারা যাইতেছে।

শাহানার মনে হল মৃত্যুর জন্যে দিনটি সুন্দর। আকাশ জোড়া মেঘ। বর্ষার অপূর্ব সকাল। তার নিজের মৃত্যুর সময় প্রকৃতি কেমন থাকবে? সে কি রাতে মারা যাবে, না দিনে? সবচে' ভাল হত পূর্ণিমার রাতে মরতে পারলে — একটা গান আছে না — "চান্নি পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়।" মতি মিয়া কি গানটা জানে?

শাহানা সহজ গলায় বলল, শুনুন, আপনি কি এই গানটা জানেন — ঐ যে "চান্নি পহর রাইতে যেন আমার মরণ হয়"?

মতি অবাক হয়ে পেছন ফিরল — কি আশ্চর্য, এই সময় কোন মেয়ের মাথায় গানের কথা আসে?

'গানটা জানেন না, তাই না?'

'জ্বি-না।'

'খুব সুন্দর গান। আমার গলায় সুর নেই। সুর থাকলে আপনাকে শুনাতাম। রোগির বাড়ি কত দূর?'

'ঐ যে দেখা যায়।'

শাহানার মনে হল রোগির বাড়ি আরেকটু দূর হলে ভাল হত। কেন জানি এই ভোরবেলায় ছুটতে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে হঠাৎ বয়স কমে গিয়ে সে নীতুর বয়েসী হয়ে গেছে।

পরাণের উঠোনে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের মানুষদের এই এক অভ্যাস — বিপদে তেমন সাহায্য করতে পারে না কিন্তু সবাই পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা কৌতূহলী হয়ে দেখছে শাহানাকে। বাচ্চা একটা মেয়ে — জটিল ও ভয়াবহ বিপদে এই মেয়ে কি করবে?

শাহানা সবার কৌতূহলী চোখের উপর ঘরে ঢুকল।

ঘরে তেমন আলো নেই। আকাশ মেঘলা থাকায় আলো ম্লান ও বিবর্ণ। গ্রামের

বাড়িগুলির জানালা থাকে না। একটামাত্র দরজা — সেই দরজা বন্ধ। ঘর অন্ধকার। একটা হারিকেন জ্বলছে, একটা কুপি জ্বলছে। হারিকেন ও কুপির ক্ষীণ আলো অন্ধকার কাটাতে পারছে না।

খোদেজার মা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে শাহানার দিকে। কি মিষ্টি কিশোরীদের মত মুখ! কি মায়া মায়া টানা চোখ। এই মেয়ের দিকে তাকালেই মনে হয় এই মেয়ে পৃথিবীর কোন জটিলতাই জানে না। কিন্তু মেয়েটি হাঁটু গেড়ে দূর্গার চৌকির কাছে বসেছে। তার বসার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে কি করবে বা কি করবে না সে সম্পর্কে তার খুব পরিষ্কার ধারণা আছে। তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। মেয়েটি দূর্গার পেটে হাত রেখেই চমকে উঠল। তার চমকানি বলে দিচ্ছে সে তার কাজ জানে। শুধু যে জানে তাই না — খুব ভাল করে জানে। খোদেজার মা হঠাৎ খানিকটা ভরসা পেল। যুদ্ধক্ষেত্রে রণক্লান্ত সৈনিকের পাশে একজন তুখোড় যোদ্ধা এসে দাঁড়ালে ক্লান্ত যোদ্ধা যে ভরসা পায় — সেই ভরসা।

শাহানার হাত কাঁপছে। বুক ধ্বক ধ্বক করছে। দুটাই খারাপ লক্ষণ। নার্ভ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। নার্ভ ঠিক রাখতে হবে। এই পরিস্থিতিতে নার্ভ ঠিক রাখা কি সম্ভব? এই বিদ্যা যারা তাকে দিয়েছেন — তাঁরা কি নার্ভ ঠিক রাখতে পারতেন? পরিস্থিতি ভয়াবহ — শিশুটি যে পজিশনে আছে তাতে ডেলিভারি হবে না। সে চলে এসেছে বার্থ ক্যানেলের মুখে। সেখানে তার মাথা থাকার কথা — মাথা নেই। শিশুটি বার্থ ক্যানেলে আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। তার অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। মায়ের যে জরায়ু তাকে এতদিন আশ্রয় দিয়েছে সেই জরায়ু এখন তাকে ঠেলে বের করে দিতে যাচ্ছে।

অসহায় শিশু আটকা পড়ে গেছে। মা মা বলে শিশুটি মনে মনে হয়ত কাঁদিছে। অচেতন মা শিশুর সেই কান্না শুনতে পাচ্ছেন না।

এই পরিস্থিতিতে আমার কি করণীয়? আমি শাহানা। মেডিক্যাল কলেজের সর্বকালের সেরা কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের একজন। প্রতিটি বিষয়ে আমি ডিসটিংশন পেয়েছি। রাষ্ট্রপতির দেয়া গোল্ড মেডেল আমাদের বসার ঘরের আলমিরায় সাজানো। আমার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। আমি কোন কিছুই ভুলি না —। মেডিসিনের প্রফেসর জালাল উদ্দিন ভাইভা বোর্ডে হাসতে হাসতে বলেছিলেন — "মাই লিটল গার্ল, ইউ হ্যাভ এ ফটোগ্রাফিক মেমোরী।"

কিন্তু শাহানার কিচ্ছু মনে পড়ছে না। এই পরিস্থিতিতে তাকে কি করতে হবে — গাইনীর প্রফেসার ভূঁইয়া ক্লাসে একদিন বলেছিলেন — প্রসবকালীন সময়ে মন থেকে মায়া জিনিশটা সরিয়ে দিও। কারণ মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে, মায়ার কারণে মা এবং শিশু দু'জনকে তুমি রক্ষা করতে যাবে — দু'জনকেই হারাবে।

সে সময় মায়া কম থাকলে — অন্তত একজন রক্ষা পাবে।

শাহানা কি করবে? একজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে? কাকে বাঁচাবে? মাকে, না শিশুটিকে? শাহানা খোদেজার মা'র দিকে তাকিয়ে বলল — গরম পানি আছে? হাত ধোব।

খোদেজার মা গামলায় গরম পানি নিয়ে এল। এই পানিতে জীবাণুনাশক কিছু দেয়া হয়নি। জীবাণুনাশকের জন্যে অপেক্ষা করারও কোন অর্থ হয় না। পানি অতিরিক্ত গরম — শাহানা সেই গরম অনুভব করছে না। শীত-গরমের সংবাদ যে স্নায়ু মস্তিষ্কে পৌঁছায় সেই স্নায়ু অসাড় হয়ে আছে। তার সমস্ত চেতনাই অসাড়।

খোদেজার মা বলল, আফা কি করবেন অখন?

কি করবে শাহানা নিজেও জানে না। তার কি করা উচিত তা যদি একজন কেউ বলে দিত! দূর থেকে শুধু যদি বলত — শাহানা, এখন এটা কর — এখন ওটা কর। শাহানা করত। নির্ভুলভাবে করত। শাহানকে বলে দেবার কেউ নেই।

ভূঁইয়া স্যার একবার ক্লাসে বলেছিলেন -- মেডিকেল প্রফেশনে মাঝে মাঝে তোমরা ভয়াবহ সমস্যায় পড়বে। তখন আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করবে। দেখবে এতে নার্ভের জড়তা কেটে যাবে। সহজভাবে চিন্তা করতে পারবে।

শাহানা বলেছিল, নার্ভের জড়তা কে কাটিয়ে দেন? আল্লাহ্‌?

স্যার বলেছিলেন, হয়ত তিনিই কাটান। কিংবা হয়ত তাঁর কাছে প্রার্থনা করার কারণে নিজের মনের ভেতর থেকে এক ধরনের শক্তি আসে।

'যে আল্লাহ্‌ ডাক্তারের নার্ভের জড়তা কাটান তিনি কেন সরাসরি রোগিকে সুস্থ করে দেন না?'

'সেটা উনি বলতে পরবেন। আমি পারব না। উনার কর্ম পদ্ধতি বোঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে।'

শাহানা কঠিন গলায় বলেছিল, স্যার, আমার ধারণা, আল্লাহ্‌, ধর্ম এইসব মানুষের সৃষ্টি। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেন নি। ম্যান ক্রিয়েটেড গড।

'হতে পারে। এটা যেহেতু ধর্মতত্ত্বের ক্লাস না সেহেতু আসুন আমাদের টপিকে ফিরে যাই — শরীরতত্ত্ব।'

আজ এতদিন পর তার কেন মনে হচ্ছে — আল্লাহ্‌ বলে একজন কেউ থাকলেও থাকতে পারেন। তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।

শাহানা বুক ভর্তি করে নিঃশ্বাস নিয়ে মনে মনে বলল, "ও গড অলমাইটি, প্লীজ হেল্প মি। প্লীজ হেল্প মি।"

খোদেজার মা আবার বলল, আফা, অখন কি করবেন?

শাহানা শান্তস্বরে বলল, পেটের ভেতর শেষ মুহূর্তে বাচ্চা উল্টে দেয়ার একটা

প্রাচীন পদ্ধতি আছে। ঐটা চেষ্টা করব। একবারই করব . . .

'যদি না হয় . . .'

যদি না হয়, যদি পদ্ধতি কাজ না করে তখন কি হবে শাহানা তা বলতে পারছে না। তার কপালে ঘাম জমছে — হাত আবারও কাঁপছে। পদ্ধতিটা কি সে জানে? ভাসাভাসা জানে। 'ব্রাকষ্টোন হাইক' পদ্ধতি। পুরোনো দিনের একজন অসাধারণ ডাক্তার প্রফেসর ব্রাকষ্টোন হাইক এই পদ্ধতি বের করে অনেক জীবন রক্ষা করেছেন। এই পদ্ধতির কোন প্রচলন এখন নেই — আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র প্রাচীন সব পদ্ধতিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছে —

প্রথমে বাচ্চার পা খুঁজে বের করতে হবে। তিনটি আঙুলে দু'টি পায়ের গোড়ালি ঠেলে ধরতে হবে। তারপর সামান্য উপরের দিকে ঠেলে ধরতে হবে। উপরের দিকে ঠেলার সময়টা সিনক্রোনাইজড হতে হবে জরায়ুর প্লাসমের সাথে, একটা হাত থাকবে বাইরে পেটের উপর — বাচ্চার মাথার কাছাকাছি। বাইপোলার পদ্ধতি — এক হাতে বাচ্চার পা ঠেলে দেয়া, এক হাতে মাথার নিচের দিকে চাপ দেয়া। শাহানা কি পারবে? বই পড়া বিদ্যা এবং বাস্তব ক্ষেত্র আলাদা। অভিজ্ঞতা শাহানাকে কোন সাহায্য করছে না। তার অভিজ্ঞতা শূন্য। শাহানা মনে মনে ইংরেজিতে বলল, "আই স্টার্ট বাই দ্যা নেম অব গড। গড অলমাইটি, হেল্প মি।"

শাহানা কি পারছে? শিশুটি সাড়া দিচ্ছে শাহানার আঙুলের ইশারায়? শিশুটির একটি পা পাওয়া গেছে — আরেকটি পা কোথায়? প্লেসেন্টার নালী যদি পায়ে পেঁচিয়ে থাকে তখন কি করণীয় . . . ? ঘামে শাহানার কপাল ভিজে গেছে। ভুরু ছাপিয়ে সেই ঘাম তার চোখের দিকে আসছে। সে শান্ত গলায় খোদেজার মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আমার কপালের ঘাম মুছে দিন। বাঁ হাতটা সে শিশুর মাথার উপর রেখেছে। ডান হাতে সে খুঁজছে শিশুটির পা। তার নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বুক ধ্বক ধ্বক করছে। শিশুর দ্বিতীয় পা'টি পাওয়া যাচ্ছে না। . . . এই তো, এই তো পাওয়া গেছে। ও গড্ প্লীজ হেল্প মি।

আধো তন্দ্রা আধো জাগরণের ভেতর দিয়ে দুর্গা শুনছে খোদেজার মা'র আনন্দিত গলা — দেখ, তোমার কন্যারে দেখ। কি সুন্দর কন্যা!

দূর্গা অনেক কষ্টে চোখ মেলল। কই, সে তার বাচ্চাটাকে তো দেখছে না — সে দেখছে পরীর মত সুন্দর একটা মেয়েকে। এই সুন্দর মেয়েটা কে? কার বাড়ির মেয়ে? সে এখানে কেন?

প্রবল ঘুমে দূর্গা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। ঘুমের ঘোরেই সে শুনল — শিশু কাঁদছে। কাছে কোথাও নয় — দূরে, অনেক দূরে — এই শিশুটি তার। হারানো দুই কন্যাই কি

আবার ফিরে এসেছে?

খোদেজার মা শাহানার দিকে তাকিয়ে বলল, আফা, এই মেয়ে বড় হইলে আপনের মত সুন্দর হইব — দেখেন কি গায়ের রঙ! ওমা, আপনের দিকে প্যাটপ্যাট কইরা আবার দেখি চায়। আপনেরে হিংসা করতেছে আফা . . .

শাহানা দরজা খুলে বের হয়েছে। কোনদিকে না তাকিয়ে সে প্রায় ছুটে যাচ্ছে। সে চায় না কেউ তাকে এখন দেখুক। তার চোখ ভর্তি পানি। চোখ ছাপিয়ে এত পানি কেন আসছে তাও সে জানে না।

না, সে কোনদিন বড় ডাক্তার হতে পারবে না। বড় ডাক্তাররা হন আবেগশূন্য — তাঁরা অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক যন্ত্র। শাহানা শাড়ির আচলে চোখ মুছে নিজেকে শান্ত করল। তার ইচ্ছা হচ্ছে সে কিশোরীদের মত ছুটতে ছুটতে যায় — কিন্তু তার শরীর অবসন্ন। পা চলছে না।

তার পেছনে পেছনে মতি যাচ্ছে। অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ হওয়ায় শাহানা পেছন ফিরে মতিকে দেখল। মতি শব্দ করে কাঁদছে।

শাহানা বলল, কি হয়েছে আপনার?

মতি অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, কিছু হয় নাই। এত আনন্দ হইতেছে, মনে হইতেছে চিক্কুর দিয়া কান্দি।

শাহানা হাসল। তার মনে হচ্ছিল তাকে হাসতে দেখে মতিও নিজেকে সামলে নিয়ে হাসার চেষ্টা করবে — তা হল না। মতি কাঁদছেই।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। শাহানা বলল, আপনাকে আমার পেছনে পেছনে আসতে হবে না। আপনি আপনার বাড়িতে চলে যান।

'আপনার জন্যে একটা ছাতি নিয়া আসি।'

'আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না। আমি আজ বৃষ্টিতে ভিজব। অনেকদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয় না। বাবা বৃষ্টির সময় আমাদের ছাদে যেতে দেয় না। বাবার ধারণা ছাদে গেলেই — আমাদের মাথায় বজ্রপাত হবে।'

'শ্রাবণমাসের বৃষ্টিতে বজ্রপাত হয় না।'

'তাই না-কি? জানতাম না তো। হলেও আজ আমি মনের সাধ মিটিয়ে ভিজব।'

মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘোর বর্ষণ। শাহানা খুশি খুশি গলায় বলল, খবর্দার আপনি আমার পেছনে পেছনে আসবেন না।

শাহানা এবার কিশোরীদের মতোই ছুটছে। তীরের ফলার মত বৃষ্টি এসে তাকে বিঁধছে। হাওয়ায় উড়ছে শাড়ির আঁচল। সে ছুটে যাচ্ছে হাওড়ের দিকে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সে হাওড়ের পানি ছুঁয়ে দেখবে।

হাওড়ের দিক থেকে শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। বাতাস পেয়ে ফুলে ফেঁপে হাওড় হয়েছে সমুদ্রের মত। ভয়ংকর আক্রোশে সে গর্জন করছে . . .

১০

ইরতাজুদ্দিন সাহেব তাঁর শোবার ঘরে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর মুখ জানালার দিকে। দোতলার জানালা বলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তিনি শাহানাকে ভিজতে ভিজতে হাওড়ের দিকে যেতে দেখলেন — আবার ফিরে আসতেও দেখলেন। তাঁর মধ্যে কোন রকম বাহ্যিক চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তিনি যে ভাবে আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন ঠিক সে ভাবেই রইলেন। ইজিচেয়ারের হাতলে পেতলের বাটিতে পেঁপে কেটে দেয়া হয়েছে। তিনি তা স্পর্শও করেননি। সকাল ৯টার মত বাজে। এই সময়ে তাঁর এক বাটি পাকা পেঁপে খাবার কথা। কবিরাজের পরামর্শমত দীর্ঘদিন ধরে খাচ্ছেন — আজ তার ব্যতিক্রম হল।

তিনি দুই নাতনীকে দেখে যে প্রবল আনন্দ পেয়েছিলেন সেই আনন্দ স্থায়ী হয়নি। তিনি মেয়ে দু'টির সঙ্গে মিশতে পারছেন না। মেয়ে দু'টিও তাঁর সঙ্গ তেমন পছন্দ করছে না। নীতু সারাক্ষণ ঘুরছে পুষ্পকে নিয়ে। প্রবল উৎসাহে তাকে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে জ্ঞান বিতরণের মহৎ উদ্দেশ্যেই তার সুখানপুকুর আগমন। গল্প করার জন্যে তাকে যখনই ডাকা হয় তখনি সে বলে — একটু পরে আসব দাদাজান। এখন কাজ করছি। সেই "একটু পর" আর আসে না।

নীতুর যেমন পুষ্প জুটেছে শাহানার তেমন কেউ জুটেনি। ইরতাজুদ্দিন সাহেব নিশ্চিত হয়েছেন — এই মেয়েটি একা থাকতেই বেশি পছন্দ করে। বেড়াতে এসেছে, কোথায় হৈ-চৈ করবে তা না, বেশির ভাগ সময়ই হাতে মোটা একটা বই। সেটা গল্পের বইও না, ডাক্তারি বই। অথচ মেয়েটা এমনভাবে বইটা পড়ে যে মনে হয় দারুণ মজার কোন গল্পের বই পড়ছে।

ইরতাজুদ্দিন সাহেব ভেবে রেখেছিলেন, মেয়ে দু'টিকে তিনি নিজে গ্রাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন — কিন্তু মেয়েদের তাতে কোনি উৎসাহ দেখা গেল না। ছোটটি ঘর থেকেই বের হতে চায় না — বড় জন বেড়ুতে চায় — কিন্তু একা একা। মেয়ে দু'টি তাঁকে পছন্দ করছে না।

এ সময়ের আধুনিক মেয়েদের মন পাবার কলা-কৌশল তাঁর জানা নেই। তিনি চেষ্টা করেছেন নিজের মত। ছাদে উঠতে চেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ছাদে ওঠার সিঁড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। কাঠাল গাছে চওড়া দোলনা লাগিয়ে দিয়েছেন। হাওড় দেখার জন্যে বড় একটা বজরা নৌকা আনিয়ে ঘাটে বেঁধে রেখেছেন। মেয়ে দু'টি তাঁর আন্তরিক চেষ্টার কোন মূল্য দিচ্ছে না। তারা আছে নিজেদের মত।

ইরতাজুদ্দিন সাহেবের এখন মনে হচ্ছে, তিনি সামান্য ভুল করেছেন। এরা দু'দিন থাকার জন্যে এসেছিল, দু'দিন থেকে চলে গেলেই ভাল হত।

জোর করে আটকে রেখে তিনি এদেরও কষ্ট দিচ্ছেন, নিজেও খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি মেয়েদের কষ্টটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু মেয়ে দু'টি তাঁর কষ্ট বুঝতে পারছে না। দিনের পর দিন একটা বিশাল বাড়িতে একা থাকার কষ্ট মেয়ে দু'টি জানে না।

তাঁর বয়স হয়েছে। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করার মত বয়স। এই অপেক্ষা প্রিয় ও ঘনিষ্ঠজনদের চারপাশে নিয়ে করা যায় — কিন্তু একা একা নির্বান্ধব পুরীতে বসে অপেক্ষা করা যায় না.।

ইরতাজুদ্দিন চামচে করে এক টুকরা পেঁপে মুখে দিলেন। খুব মিষ্টি পেঁপে। ফজলি আমের মত মিষ্টি — নীতু আর শাহানকে কি পেপে দেয়া হয়েছে? তিনি ভারি গলায় ডাকলেন — রমিজের মা।

রমিজের মা ঘরে ঢুকল না। ঢুকল শাহানা। সে এর মধ্যে ভেজা শাড়ি পাল্টেছে। টাওয়েল জড়িয়ে মাথায় চুল শুকাচ্ছে। শাহানা বলল, আপনার কি কিছু চাই দাদাজান?

ইরতাজুদ্দিন বললেন, না।

'ঐ মহিলার একজন মেয়ে হয়েছে। খুব সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। শেষ সময়ে সহজ ডেলিভারি হয়েছে।'

'তোর ডাক্তারি বিদ্যা কাজে লেগেছে?'

'হুঁ লেগেছে। আপনার কি শরীর খারাপ?'

'না।'

শাহানা খাটের এক মাথায় বসতে বসতে বলল, আপনার নিষেধ অমান্য করে আমি গিয়েছি, সে জন্যে কি আপনি আমার উপর রাগ করেছেন?

'না।'

'আমার উপর রাগ করার আপনার নিশ্চয়ই নিজস্ব কিছু কারণ আছে যদিও আমি তা ধরতে পারছি না। আপনি দয়া করে আমার উপর রাগ করবেন না।'

'রাগ করছি না।'

'যাই দাদাজান?'

'আচ্ছা যা।'

যাই বলার পরেও শাহানা খাটের পাশে বসে রইল। সে একটা বিশেষ কথা বলার জন্যে আসছে, কথাটা এতই মুহূর্তে বলবে, না পরে বলবে বুঝতে পারছে না। বিশেষ কোন কথা বলার জন্যে বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত লাগে। কোন কোন মানুষ সেই

মুহূর্তগুলি ধরতে পারে। অনেকেই পারে না। যেমন সে পারে না।

'দাদাজান।'

'হুঁ।'

'আপনার এই সুন্দর বাড়িটার কোন নাম নেই কেন?'

'আপনার বাড়ি বলছিস কেন? বাড়িটা তোদেরও না? এটা আমাদের সবার বাড়ি।'

'বাড়িটার সুন্দর একটা নাম থাকলে ভাল হত।'

ইরতাজুদ্দিন উৎসাহের সঙ্গে বললেন, দে, একটা নাম দে। সুন্দর নাম দে। ময়মনসিংহ থেকে সাইনবোর্ড বানিয়ে এনে তোরা থাকতে থাকতে লাগিয়ে দেব।'

শাহানা আরেকটু ঝুঁকে এসে বলল — এই বাড়িটাকে একটা হাসপাতাল বানিয়ে ফেললে কেমন হয় দাদাজান?

ইরতাজুদ্দিন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। শাহনা উৎসাহের সঙ্গে বলল, বাড়িতে পা দেয়ার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে — এখানে খুব সুন্দর একটা হাসপাতাল হয়।

'আমাদের পাঁচপুরুষের ভিটাকে তুই হাসপাতাল বানাতে চাস? এইসব বুদ্ধি কে মাথায় ঢুকিয়েছে? তোর বাবা?'

'বাবা কিছু বলেননি — যা বলার আমি নিজ থেকে বলছি।'

ইরতাজুদ্দিন আহত গলায় বললেন — পূর্বপুরুষের কত স্মৃতি জড়ানো ভিটা, তার কোন মূল্য নেই তোর কাছে?

তাঁর মাথার শিরা দপদপ করছে। তিনি বুকের উপর চাপ ব্যথাও অনুভব করছেন। সূক্ষ্ম এক আতংকও অনুভব করছেন। তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। তিনি আর অল্প কিছু দিন বাঁচবেন, তারপর এরা তাঁর এই অসম্ভব সুন্দর বাড়িটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। মৃত্যুর আগে বাড়িটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে কেমন হয়?

শাহানা লক্ষ্য করল, তার দাদাজান হাসছেন। আন্তরিকভাবেই হাসছেন। সে বলল, হাসছেন কেন দাদাজান?

ইরতাজুদ্দিন বললেন, এম্নি হাসছি।

তিনি পেঁপের বাটি হাতে নিতে নিতে বললেন, রমিজের মা'কে বল্ তোদের পেঁপে কেটে দিতে। খুব মিষ্টি পেঁপে। আমি নিজে এত মিষ্টি পেঁপে কখনো খাইনি।

ইরতাজুদ্দিন চামচ দিয়ে পেঁপের গায়ে লেগে থাকা কালো বিচি আলাদা করছেন। বিচিগুলি পুঁতে দিলে হয়। পেঁপে গাছ ফলবতী হতে বেশি সময় লাগে না — কে জানে তিনি হয়ত এই পেঁপে খেয়ে যেতে পারেন।

১১

পুষ্পকে নতুন শাড়ি কিনে দেয়া হয়েছে। সবুজ রঙের শাড়ি। কালো শরীরে সবুজ শাড়ি এত সুন্দর মানিয়েছে! নীতুর একটু মন খারাপ লাগছে — কেন তার গায়ের রং এত ফর্সা হল! গায়ের রঙ পুষ্পের মত কুচকুচে কালো হলে সেও অবশ্যি একটা সবুজ শাড়ি কিনত। পুষ্প আজ তার বিছানা-বালিশ নিয়ে এসেছে। এখন থেকে রাতেও এই বাড়িতে থাকবে। বিছানা-বালিশ বলতে একটা মাদুর আর একটা বালিশ। বালিশটা খুব বাহারী — ফুল লতা পাতা আঁকা। সরু সূতায় পুষ্পের নাম লেখা।

নীতু এখন শাহানার সঙ্গে ঘুমুচ্ছে না। তার জন্য আলাদা ঘর। সে এবং পুষ্প এই ঘরে শোয়। ঘরটা নীতুর খুব পছন্দ হয়েছে। এই ঘর থেকে হাওড় দেখা যায়। তবে এই ঘরের সমস্যা একটাই — ভোরবেলা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো একেবারে মুখের উপর এসে পড়ে। ঘুম ভেঙে যায়। ছুটিছাটার দিনে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমুতে ইচ্ছা করে। এই ঘরে থাকলে সে উপায় নেই।

সন্ধ্যা সাতটা। ইরতাজুদ্দিন কিছুক্ষণ আগে নীতুকে খামবন্ধ চিঠি দিয়েছেন। নীতুর বাবার চিঠি। তিনি হাতে হাতেই নীতুর চিঠির উত্তর পাঠিয়েছেন। সেই চিঠি পড়ে নীতুর মন খারাপ হল। কারণ চিঠি পড়ে পরিষ্কার বোঝা যায়, নীতুর বাবা নীতুর চিঠি না পড়েই জবাব দিয়েছেন। অতি বোকা মেয়েও সেটা বুঝবে। নীতু বোকা মেয়ে না। তিনি লিখেছেন —

মা নীতু,

তোমার চিঠি পড়ে খুব ভাল লাগল। দাদার বাড়িতে তোমরা খুব আনন্দ করছ জেনে খুশি হয়েছি।

(এই লাইন পড়েই নীতু বুঝেছে বাবা চিঠি না পড়েই জবাব দিচ্ছেন। কারণ নীতু তার চিঠিতে কোথাও লেখেনি তারা খুব আনন্দ করছে।)

ন' তারিখে তোমার মা সিঙ্গাপুর যেতে চাচ্ছে — সে শাহানার বিয়ের কিছু কেনাকাটা করবে। মনে হচ্ছে আমাকেও সঙ্গে যেতে হতে পারে। কাজেই ইচ্ছা করলে তোমরা দাদার বাড়িতে কয়েকদিন বেশি কাটিয়ে আসতে পার।

(নীতু পরিষ্কার বুঝছে চিঠির এই প্যারাটি আপার জন্যে লেখা। বাবা জানেন আপা এই চিঠি পড়বে। পড়ে জানবে যে, তার বিয়ের কেনাকাটার জন্যে তাঁরা সিংগাপুর যাচ্ছেন। এই কথাগুলি আপাকে আলাদা করে চিঠি লিখে জানালেও হত। তা তিনি জানাবেন না।)

পানির দেশে গিয়েছ — সাবধানে থাকবে। হুটহাট করে পানিতে নামার দরকার নেই। তোমার মা ঠিক করেছে এবার ঢাকায় এলেই তোমাকে সাঁতার শেখানো হবে। তোমরা ভাল থেকো। তোমার জন্যে গল্পের বই পাঠালাম। ইতি তোমার বাবা . . .

চিঠিতে কোথাও নীতুর বান্ধবীর জন্মদিনের কথার উল্লেখ নেই। চিঠি পড়লে তবে তো উল্লেখ থাকবে। তবে নীতু জানে, তার বান্ধবী যথাসময়ে টেলিফোন পাবে। বাবা তাঁর চিঠিটা তাঁর সেক্রেটারীকে দেবেন। সেক্রেটারী চাচা সেই চিঠি ফাইলবন্দী করবেন — চিঠিতে জরুরি কোন ব্যাপার থাকলে সেই মত ব্যবস্থা করবেন।

নীতু বাবার চিঠি হাতে নিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছে। বইয়ের প্যাকেট খুলে দেখতে ইচ্ছা করছে না। রাগ লাগছে। সে চিঠি নিয়ে উঠে গেল — আপাকে পড়তে দিতে হবে। তার নিজের চিঠি — অন্যকে পড়তে দিতেও ভাল লাগে না। চিঠি তো আর গল্পের বই না যে সবাই মিলেমিশে পড়বে।

শাহানা তার ঘরে বাতি নিভিয়ে শুয়েছিল। মাত্র সাতটা বাজে। এই সময় কেউ বিছানায় শুয়ে থাকে? নীতু দরজার বাইরে থেকেই ডাকল — আপা আসব?

শাহানা বলল, আয়।

'ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছ কেন?'

'এম্নি শুয়ে আছি।'

'মাথাব্যথা নেই তো?'

'না।'

'মন খারাপ?'

'হুঁ। মন একটু খারাপ।'

'কেন?'

শাহানা বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, জানি না কেন। যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোকে জানাতেম।

'বাবা আমাকে চিঠি লিখেছেন — পড়বে?'

'উহুঁ।'

'চিঠিতে তোমার একটা খবর আছে।'

'কি খবর?'

নীতু এসে খাটে পা দুলিয়ে বসল। পা নাচাতে নাচাতে বলল, তোমার তো খুব বুদ্ধি, দেখি আন্দাজ কর তো কি খবর।

'ঠিকঠাক আন্দাজ করতে পারলে আমাকে কি দিবি?'

'যা চাইবে তাই দেব।'

শাহানা তরল গলায় বলল, আমার বিয়ে সংক্রান্ত কোন খবর আছে। হয়ত ডেট ফাইন্যাল হয়েছে কিংবা মা বিয়ের কেনাকাটার জন্যে কোলকাতা বা ব্যাংকক

যাচ্ছেন। ঠিক হয়েছে?

'হুঁ।'

নীতু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। আপার বুদ্ধি দেখে মাঝে মাঝে তার এত বিস্ময়বোধ হয়! সব মানুষের বুদ্ধি যদি আপার মত হত তাহলে পৃথিবীতে বাস করাই কঠিন হত। ভাগ্যিস সবার বুদ্ধি আপার মত না।

'আপা!'

'উঁ।'

'পুষ্প মেয়েটাকে তোমার কাছে কেমন লাগছে?'

'ভাল তো। সারাক্ষণ তোর পেছনে ঘুর ঘুর করছে। মেরী হ্যাড এ লিটল ল্যাম্বের মত অবস্থা।'

'খুব মিথ্যা কথা বলে আপা — বানিয়ে বানিয়ে সারাক্ষণ মিথ্যা গল্প।'

'গল্প তো বানিয়ে বানিয়েই বলতে হবে — টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি এঁরা তো বানিয়ে বানিয়েই গল্প লেখেন।'

'আচ্ছা আপা, তুমি কি খুব বড় ডাক্তার?'

'হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?'

সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে তুমি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তার।'

'কে ছড়াল? পুষ্প?'

'খোদেজার মা নামের একজন ধাই আছে — সে ছড়াচ্ছে আর পুষ্প ছড়াচ্ছে — কথা ছড়ানোয় এই মেয়ে ওস্তাদ। কোথাও কিছু শুনলেই দশ জায়গায় ছড়াবে।'

'এই গ্রামে কোথায় কি হচ্ছে তুই তাহলে সব জানিস?'

'হুঁ জানি। মতি মিয়া নামে যে গায়ক আছে সে না-কি যেখানে যত কঠিন রোগি আছে তাদের সবাইকে শুক্রবার তাঁর বাসায় যেতে বলেছে।'

'রোগিদের নিয়ে মিছিল করবে?'

'উহুঁ — শুক্রবারে তিনি তোমাকে দাওয়াত করে নিয়ে যাবেন। তুমি বিনা পয়সায় সব রোগি দেখে দেবে। পুষ্পের এক বড় বোন আছে, যার নাম — কুসুম। সেও তোমাকে দেখাবে।'

'কুসুমের কি অসুখ?'

'কি অসুখ পুষ্প জানে না। পুষ্পের ধারণা, কুসুমের কোন অসুখ নেই — তোমাকে দেখতে চায় এই জন্যে অসুখের ভান করছে। সে নাকি খুব ভান করতে পারে। কুসুমের সঙ্গে জ্বীন থাকে। তোমাকে তো আগেই বলেছি।'

'বললেও ভুলে গেছি। কুসুমের সঙ্গে তাহলে জ্বীন থাকে!'

'তার চুল খুব লম্বা, একেবারে পায়ের পাতা পর্যন্ত। লম্বা চুলের মেয়েদের খুব জ্বীনে ধরে। এই জন্যে সে ঠিক করে ফেলেছে চুল কেটে তোমার মত ছোট করে ফেলবে।'

'আমাকে তো সে দেখেনি — বুঝল কি করে আমার চুল ছোট?'

'তোমাকে দেখেছে। তুমি একবার সাপের আড্ডাখানায় উপস্থিত হয়েছিলে, তখন দেখেছে।

শাহানা আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত গলায় বলল — একটু আগে তোর সঙ্গে আমার একটা বাজি হল না? বাজির শর্ত ছিল — আমি বাজিতে জিতলে যা চাইব তাই তুই আমাকে দিবি।

'হুঁ। আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে দেব। কি চাও তুমি?'

'আমি চাচ্ছি — তুই এখন চলে যা। কথা বলতে আর ভাল লাগছে না।'

নীতু আহত গলায় বলল, তুমি এম্নি বললেও তো আমি চলে যেতাম — শুধু শুধু বাজির কথা তুললে কেন? আমার কথা শুনে তুমি বিরক্ত হচ্ছ এটা প্রথমে বললেই চট করে উঠে দাঁড়াল। তার কান্না পেয়ে গেছে। কেঁদে ফেলার আগেই তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। সে ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে বাড়ি খেয়ে মাথা ফুলিয়ে ফেলল।

নীতুর খুব একা একা লাগছে। মনে হচ্ছে সারা বাড়িতে সে একা। পুষ্প থাকলে এতটা একা লাগত না। পুষ্প গেছে তার মা'র কাছে। নতুন শাড়ি সে তার মা'কে দেখাতে গেছে। রাতে মনে হয় আর ফিরবে না। দাদাজান বাংলোঘরে। প্রতি রাতেই তিনি একা একা দীর্ঘ সময় বাংলোঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকেন। এই সময় কেউ আশেপাশে গেলেই তিনি বিরক্ত হন। সবাইকে মনে হয় চিনতেও পারেন না। গত রাত্রে নীতুর কিছু করার ছিল না — বাংলোঘরের দিকে গেছে। জানালা দিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে দাদাজান ভুরু কুঁচকে বললেন, কে?

নীতু বলল, আমি।

দাদাজান ভুরু কুঁচকে তাকিয়েই রইলেন। মনে হল চিনতে পারছেন না। নীতু প্রায় পালিয়ে চলে এল।

আচ্ছা এখন সে কি করবে? আপার কাছে যাওয়া যাবে না, দাদাজানের কাছে যাওয়া যাবে না, সে করবে কি? গল্পের বই পড়বে? গল্পের বই পড়তে তার কখনই খারাপ লাগে না — কিন্তু এখন পড়তে ইচ্ছা করছে না। এই বাড়িতে রাতে গল্পের বই পড়ার অনেক অসুবিধা। আলো কম। কিছুক্ষণ বই পড়লেই তার মাথা ধরে যায়।

নীতু রান্নাঘরের দিকে গেল। রমিজার মা রান্নাঘরে আছে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা যায়। এই মহিলাটাও খুব ভাল — শুধু হাসে। নীতু বলেছিল, আপনি এত হাসেন কেন? সে বলেছে — মনের দুঃখে হাসি। মনে দুঃখ বেশি তো, এই জন্যে হাসিও বেশি। দার্শনিক ধরনের উত্তর। নীতুর ধারণা, গ্রামের মানুষরা সহজ সরল

হলেও সহজভাবে তারা কথা বলতে পারে না। সব কথাতেই শেষ দিকে তারা ছোট একটা প্যাঁচ লাগিয়ে দেয়। এদের কথা বলার ধরনই বোধহয় এ রকম।

নীতু রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কি করছেন?

'রানতেছি গো ময়না। খিদা লাগছে?'

'উহুঁ।'

'দেরি হইব না, তরকারি নামালেই ভাত দিয়া দিমু।'

'আপনারে তো বলেছি — আমার খিদে লাগেনি।'

'কোন দুপুরে ভাত খাইছ — খিদা তো লাগনেরই কথা।'

'বলেছি তো খিদে হয়নি।'

নীতু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। গ্রামের মানুষের এই আরেক সমস্যা — তারা নিজে কি ভাবছে সেটাই বড়। অন্যে কি ভাবছে কি ভাবছে না সেটা জরুরি না। নীতু রান্নাঘর থেকে বের হল। ছাদে উঠলে কেমন হয়? কাঠের সিঁড়ি তো আছেই — চুপি চুপি উঠে গেলেই হয়। ছাদে উঠে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা। এর মধ্যে যদি আপা তাকে খুঁজতে শুরু করে এবং খুঁজে না পায় তাহলে বেশ ভাল হয়। তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার শাস্তি হয়।

ছাদের সিঁড়িটা নড়বড়ে। নিচ থেকে একজনকে ধরতে হয়, তবু খুব সাবধানে উঠলে হয়ত ওঠা যাবে। নীতু সাবধানী মেয়ে। সে সাবধানে উঠবে। হঠাৎ করে বৃষ্টি না নামলেই হয়। আর নামলেও ক্ষতি কি-সে ভিজবে। একটু ভিজলেই তার ঠাণ্ডা লাগবে-জ্বর হবে-নিওমোনিয়া হবে-অনেক চিকিৎসা করেও তাকে বাঁচানো যাবে না।

শাহানা অনেকক্ষণ হল ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। ঠিক আলসেমির জন্যে যে শুয়ে আছে তা না — ভাল লাগছে না। মানুষের স্বভাব খানিকটা বোধহয় শামুকের মত। নিজের শক্ত খোলসের ভেতর মাঝে মাঝেই তাকে ঢুকে যেতে হয়। অতি প্রিয়জনের সঙ্গও সে সময় অসহ্যবোধ হয়।

শুয়ে শুয়ে শাহানা ভাবছে, অতি প্রিয়জন বলে তার কি কেউ আছে? মা-বাবাকে প্রিয়-অপ্রিয় কোন দলেই ফেলা যায় না। মা-বাবা শরীরের অংশের মত। কারোর হাত বা পা যেমন প্রিয়-অপ্রিয় কোনটাই হতে পারে না, মা-বাবাও পারে না। ভাই-বোন শরীরের অংশের মত নয়। প্রিয়-অপ্রিয় ব্যাপারটা তাদের ক্ষেত্রে হয়ত আসে ··· নীতু তার খুবই প্রিয়। কিন্তু নীতুর চার বছরের বড় মিতু তার তেমন প্রিয় নয়। মিতুর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলতে ভাল লাগে না। মিতুর কথা দীর্ঘ সময় শুনতেও ভাল লাগে না। অথচ মিতু চমৎকার একটা মেয়ে। তাহলে সে তার প্রিয় নয় কেন? রহস্যটা কোথায়?

শাহানা সুখানপুকুর আসবে শুনে সবচে' বেশি লাফালাফি শুরু করেছিল মিতু।

শাহানা বলল, দল বেঁধে সবাই চলে গেলে মা'র সঙ্গে কে থাকবে? মা'র শরীর ভাল না। মা'র সঙ্গে তো একজন কারও থাকা দরকার। মিতু কয়েক মুহূর্ত শাহানার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আচ্ছা আমি থাকব। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার মধ্যে মিতু চোখে চোখে অনেক কথা বলে ফেলল। সেই কথাগুলি হচ্ছে — তুমি আমাকে নিতে চাচ্ছ না কেন আপা? আমি কি করেছি? কিছুদিন পরে তুমি বাইরে চলে যাচ্ছ, আবার কবে আসবে না আসবে কে জানে! এই কিছুদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চাই। তুমি তাতে রাজি হচ্ছ না কেন? আমি যে তোমাকে কি প্রচণ্ড ভালবাসি তুমি জান না?

মিতুর প্রতি কি শাহানার গোপন কোন ঈর্ষা আছে? হয়ত আছে। ঈর্ষা করার মত কিছু কি তার আছে? মিতু সহজ সরল ধরনের মেয়ে। তার পড়তে ভাল লাগে না। বইয়ের ধারে-কাছেও সে যায় না।

পরীক্ষার আগে আগে বই নিয়ে বসে আর প্রতি দশ মিনিট পর পর বলে — সর্বনাশ হয়েছে, এইবার ধরা খাব।

মা কঠিন গলায় বলেন — ধরা খাব আবার কি রকম কথা? ধরা খাব মানে কি?

'ধরা খাব মানে হচ্ছে গোল্লা খাব।'

'কথাবার্তাগুলি আরেকটু সুন্দর কর মা।'

'আচ্ছা যাও — এখন থেকে সুন্দর করে কথা বলব — শান্তিনিকেতনী ঢং-এ অর্ধেক কথা বলব নাকে — হি হি হি।'

মিতু কোন পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পারেনি — সব পরীক্ষায় টেনে-টুনে সেকেন্ড ডিভিশন মার্ক। এতেই সে খুশি। সে সব কিছুতেই খুশি। তাকে বকলেও সে খুশি। যেন এই পৃথিবীতে সে বকা খেয়ে খুশি হবার জন্যেই এসেছে। মিতুকে কি শাহানা তার এই খুশি হবার অস্বাভাবিক গুণের জন্যেই ঈর্ষা করে? করতে পারে।

শাহানার বিয়ে ঠিকঠাক করার পর তার মন খুব খারাপ হল। নিতান্তই অপরিচিত একটি ছেলে। কয়েকদিন মাত্র দেখা হয়েছে। দু'বার রেস্টুরেন্টে গিয়ে চা খেয়েছে। একবার গাড়িতে করে মেঘনা ব্রীজ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছে। ছেলেটি কেমন সে কিছুই জানে না। তার সঙ্গে জীবনের বাকি অংশটা কাটাতে হবে। কি রকম হবে সে জীবন? গভীর রাতে যদি তার হঠাৎ প্রিয় কোন বইয়ের কয়েকটা পাতা পড়তে ইচ্ছা করে তাহলে সে কি বলবে — রাত তিনটায় বাতি জ্বালিয়েছ কেন? বাতি নেভাও। চোখে আলো লাগছে। কিংবা মাঝে মাঝে যখন মানুষের শামুকের মত তার নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করে তখন সে বিরক্ত হয়ে বলবে না তো — কি হয়েছে তোমার, দরজা বন্ধ করে বসে আছ কেন? সমস্যাটা কি? সে তো সমস্যাটা কি

বলতে পারবে না। তখন কি হবে? বিয়ের কিছুদিন পর ছেলেটিকে যদি অসহ্যবোধ হয় — তখন? বুক ভর্তি ঘৃণা নিয়ে সে প্রতি রাতে তার সঙ্গে ঘুমুতে যাবে? মাঝে মাঝে সে যখন জড়ানো গলায় বলবে — এই, কাছে আস। তখন তাকে কাছে এগিয়ে যেতে হবে? সমস্ত অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠলেও তাকে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে হবে ঘামে ভেজা একটা শরীর। কোন মানে হয়?

এই অবস্থায় মিতু একদিন এসে বলল — আপা, তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। শুনবে?

শাহানা না বলার আগেই মিতু তার কথা শুরু করল — বিয়ে ঠিকঠাক হবার পরে তুমি ভয়ে এমন অস্থির হয়ে পড়েছ কেন? একজন মানুষের ভেতর অনেক রহস্য থাকে, বুঝলে আপা, রহস্যের জট খুলতে খুলতে সাত-আট বছর লেগে যায়। এই সাত-আট বছরে সংসারে নতুন শিশু আসে — পারিবারিক বন্ধনে জড়িয়ে যেতে হয়। বিয়েটা মজার এবং আনন্দের একটা ব্যাপার। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। আর তুমি তো প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী মেয়ে। তুমি তো তোমার স্বামীকে খুব সাবধানে নিজের মত করে তৈরি করে নিতে পারবে। তুমি যা চাও, দেখবে, আস্তে আস্তে অবস্থা এমন হবে যে ভদ্রলোকও তা-ই চাইবেন। মাঝরাতে বাতি জ্বালিয়ে গম্ভীর গলায় বলবেন — শাহানা, কিছু মনে কর না, হঠাৎ ঘুম ভাঙল। এখন আমার প্রিয় উপন্যাসের পাতা না পড়লে আর ঘুম আসবে না। অবস্থা এ রকম হতে বাধ্য। অসুবিধা হবে আমার বা আমার মত মেয়েদের।

'কি অসুবিধা?'

'আমি তো আপা হাবা-টাইপ মেয়ে। আমি বিয়ের পর পর স্বামীর প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকব। আমার মনে হতে থাকবে, এই পৃথিবীতে আমার জন্ম হয়েছে স্বামী নামক মানুষটিকে খুশি করার জন্যে এবং সেই খুশি করতে গিয়ে এমন সব ছেলেমানুষি করব যে আশেপাশের সবাই বলবে-ছিঃ ছিঃ !মেয়েটার কি লজ্জা-শরম নেই?'

'তোর কি ধারণা তুই হাবা-টাইপ মেয়ে?'

'না, আমি আসলে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, তবে চিন্তা-ভাবনা করি হাবার মত।'

'কেন?'

'এম্নি। আচ্ছা তুমি এমন মুখ শুকনো করে থেকো না। চল এক কাজ করি — তিনজনে মিলে কোথাও ঘুরে আসি — খুব হৈ-চৈ করে আসি।'

'কোথায় যাবি?'

'সুখানপুকুর যাবে? চল দাদাজানকে দেখে আসি। ঐ বাড়িটাতে আমার খুব যেতে ইচ্ছা করে। চল না আমরা তিন বোন মিলে হুট করে এক রাতে উপস্থিত হয়ে দাদাজানকে চমকে দেই।'

শাহানা শান্ত স্বরে বলেছিল, কাউকে চমকে দিয়ে আমি তোর মত আনন্দ পাই না। আমি ঢাকাতেই থাকব — কোথাও যাব না।

'শহরের বাইরে কিছুদিন থাকলে তোমার কিন্তু খুব ভাল লাগবে আপা। ঠাণ্ডা মাথায় বিয়ে-টিয়ে এইসব নিয়ে চিন্তা করতে পারবে। এক কাজ কর — আমাদের নেবার দরকার নেই — তুমি বরং মনসুর ভাইকে নিয়ে যাও। বিয়ের আগের ভালবাসাবাসি দাদাজানের রাজপ্রাসাদে হোক। আমি বলব মনসুর ভাইকে?'

'না।'

'একটা সেকেন্ড থট দাও আপা, প্লীজ।'

'কোন থটই দেব না।'

শাহানা তার কথা রাখেনি। ঢাকার বাইরে তার থাকার ব্যাপার নিয়ে সে অনেক ভেবেছে। তারপর হঠাৎ ঠিক করেছে — সে যাবে সুখানপুকুর কিন্তু মিতুকে সঙ্গে নেবে না। মানুষের মন এত বিচিত্র কেন?

বৃষ্টি পড়ছে। কি সুন্দর ঝম ঝম শব্দ! শাহানা উঠে বসল। রমিজের মা হারিকেন হাতে ঘরে ঢুকে বলল — ছোট আফা কই? ছোট আফা?

'ঘরেই আছে। কোথায় যাবে।'

'না ঘরে নাই। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতাছে আফা।'

'বুক ধড়াস ধড়াস করার কিছু নেই — ও ছাদে উঠে ভিজছে।'

'কি কন আফা! কি সর্বনাশের কথা!'

'কোন সর্বনাশের কথা না — চল যাই, আমি নামিয়ে আনছি।'

বৃষ্টিতে ভিজে ছাদ পিচ্ছিল হয়ে আছে। রেলিং-নেই ছাদের এক কোণায় উবু হয়ে নীতু বসে আছে। শাহানা বলল, কি হয়েছে নীতু?

'নীতু জবাব দিল না।'

'তুই কি আমার উপর রাগ করে ছাদে এসে বসে আছিস?'

'হুঁ।'

'আয় নিচে যাই। সাবধানে পা ফেলবি। যা পিছল ছাদ! আমার হাত ধর।'

নীতু বলল, আমার কারো হাত ধরার দরকার নেই।

'সময় হোক তখন দেখা যাবে, কারোর না কারোর হাত ধরার জন্যে পাগল হয়ে গেছিস।'

রমিজার মা নিচে কাঠের সিঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রমিজার মা'র পাশে ইরতাজুদ্দিন সাহেব। একজন কামলা ইরতাজুদ্দিন সাহেবের মাথায় ছাতা ধরে আছে। ইরতাজুদ্দিন সাহেব বিস্মিত হয়ে ভাবছেন — মেয়ে দু'টির মাথা কি পুরোপুরি খারাপ?

১২

ইরতাজুদ্দিন সাহেব নীতুকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছেন। তাঁর মন বিষণ্ণ। ভুরু কুঁচকে আছে। তিনি দুই নাতনীকে সঙ্গে নিয়েই বেড়াতে বের হতে চেয়েছিলেন। শাহানা আসতে রাজি হয়নি। তাঁর মুখের উপর কেউ না বলবে এতে তিনি এখনো অভ্যস্ত হননি যদিও এই ব্যাপারটি এখন হচ্ছে।

শ্রাবণ মাসের সকাল। আকাশে চকচকে রোদ। রোদ তাদের কাবু করতে পারছে না। কারণ তারা যাচ্ছে ছায়ায় ছায়ায়। তারপরেও দু'জন লোক দু'টা ছাতা হাতে পেছনে পেছনে আছে।

নীতুর শরীর ভাল না। বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। সর্দি হয়েছে — নাক বন্ধ। মনে হয় একটু জ্বরও এসেছে। জ্বরের কথা সে কাউকে বলেনি। নিজের অসুখ-বিসুখের কথা তার কাউকে বলতে ভাল লাগে না। ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতে তার বেশ মজা লাগছে — শুধু কাদার জন্যে পা নোংরা হয়ে গা ঘিনঘিন করছে এইটুকুই কষ্ট। গ্রামের একটা জিনিশই তার খারাপ লাগে — কাদা।

ইরতাজুদ্দিন বললেন — এই গ্রামের জমিজমা যা দেখছিস সবই একসময় ছিল আমাদের।

নীতু বলল, এখন আমাদের না?

'না।'

'না থাকাই ভাল। আমার জমিজমা একদম ভাল লাগে না। আমার ভাল লাগে সমুদ্র। সমুদ্র যদি কেনা যেত তাহলে আমি একটা ছোটখাট সমুদ্র কিনতাম।'

ইরতাজুদ্দিন সাহেবের ভুরু আরও কুঁচকে গেল। মেয়েটা প্র্যাকটিক্যাল হয়নি। বাস করেছে ঘোরের মধ্যে। নীতু বলল, দাদাজান, আপনি এমন গম্ভীর হয়ে আছেন কেন?

'আমি সবসময়ই গম্ভীর।'

'একা একা থাকেন তো, এই জন্যেই গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। একা একা থাকলেই মানুষ গম্ভীর হয়, বদমেজাজী হয়।'

'একা থাকা ছাড়া আমার উপায় কি?'

'ঢাকায় চলে আসুন। আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমাদের বাড়িটা তো অনেক বড়

— আপনাকে আলাদা একটা ঘর দেয়া হবে। আপনি চাইলে আপনার ঘরটা আমি সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। আমার ঘরটা আমি নিজে সাজিয়েছি।'

'সুন্দর করে সাজিয়েছিস'?

'হ্যাঁ ! খুব সুন্দর। আমার ঘরে দোতলা খাট আছে।'

'দোতলা খাট আবার কি ?'

'খাটটার দু'টা ভাগ আছে, একটা নিচে, একটা উপরে।'

'তুই কোথায় ঘুমাস, নিচে না উপরে ?'

'আমি নিচে। দাদাজান, আপনি কি এসে থাকবেন আমাদের সঙ্গে ?'

'না।'

'না কেন ?'

'তোর বাবাকে আমি পছন্দ করি না। তোর বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গাধাগুলির মধ্যে একটা।'

'বাবা শ্রেষ্ঠ গাধা কেন ?'

ইরতাজুদ্দিন বিরক্ত মুখে বললেন — কোন ছেলে যদি বাবার ভুল ধরতে চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে গাধা। ছেলে যদি কখনো তার বাবাকে বলে — আপনি কোনদিন আমার সামনে আসবেন না। আমি আপনার মুখ দেখতে চাই না, তাহলে বুঝতে হবে সেই ছেলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গাধা।

নীতু সহজ গলায় বলল, আপনি তো খুব বড় অন্যায় করেছেন এই জন্যে বাবা এইসব কথা বলেছেন। আপনি অন্যায় না করলে বাবা কখনো এইসব কথা বলতেন না। বাবা আপনাকে দারুণ পছন্দ করে।

ইরতাজুদ্দিন স্তম্ভিত হয়ে বললেন, আমি অন্যায় করেছি ?

নীতু সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ।

যেন এই ব্যাপারে তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইরতাজুদ্দিন বললেন, আমি কি অন্যায় করেছি সেটাও কি তোর বাবা বলেছে ?

'হ্যাঁ বলেছেন। একবার না, অনেকবার বলেছেন।'

'ও আচ্ছা ! আর কি বলেছে ?'

'আর বলেছেন মানুষ মাত্রই ভুল করে — তারপর ভুল বুঝতে পারে। তোমার দাদাজান একমাত্র ব্যক্তি যে ভুল করে কিন্তু ভুল করেছে তা বুঝতে পারে না।'

'তোর বাবা ভুল করে না ?'

'নিশ্চয়ই করেন — ছোটখাট ভুল করেন — আপনার মত বড় ভুল করেন না।?'

ইরতাজুদ্দিন অনেক কষ্টে রাগ সামলালেন। বাচ্চা একটা মেয়ের সঙ্গে তর্কে-বিতর্কে যাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। মেয়েগুলির শিক্ষা ঠিকমত হচ্ছে না। শিক্ষায়

ত্রুটি আছে। মুরুব্বীদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় যে সামান্য আদব-কায়দা রাখতে হয় তাও তারা জানে না। মনে যা আছে ফট করে বলে ফেলে। মনের কথা চেপে রাখতে পারাও বড় গুণের একটি।

ইরতাজুদ্দিন সাহেবের স্বাস্থ্য এই বয়সেও বেশ ভাল, তারপরেও তিনি খানিকটা ক্লান্তিবোধ করছেন। পিপাসা বোধ হচ্ছে। কোথাও বসে ডাবের পানি খেতে পারলে হত। বসার জায়গা নেই। কোন এক বাড়ির সামনে দাঁড়ালে তারা ছুটাছুটি করে চেয়ারের ব্যবস্থা করবে — তাঁর ইচ্ছা করছে না। গ্রামের কোন বাড়িতে তিনি যান না, বসে গল্প-গুজবের তো প্রশ্নই উঠে না।

'ক্লান্ত হয়েছিস নাকি রে নীতু?'

'না। পা ধোব দাদাজান, পায়ে কাদা লেগেছে।'

ইরতাজুদ্দিন নাতনীর হাত ধরে নৌকা-ঘাটার দিকে যাচ্ছেন। নৌকা-ঘাটায় কয়েকটা নৌকা বাঁধা আছে। তার একটাতে উঠেই মেয়ে পা ধুতে পারবে। ফেরার পথে হেঁটে না ফিরে নৌকায় ফিরলেই হবে। নৌকা থামবে বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া ঘাটে।

নৌকা-ঘাটায় যারা ছিল তাদের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা দিল। সবাই ছুটে এসে বিনীত ভঙ্গিতে ইরতাজুদ্দিনকে ঘিরে দাঁড়াল। পাঁচজন মানুষের সবাই আলাদা আলাদাভাবে বলল স্লামালিকুম। ইরতাজুদ্দিন তাদের সালামের জবাব না দিয়ে বললেন — তোদের খবর কি?

বুড়ো এক লোক হাত কচলাতে কচলাতে বলল — জ্বে খবর ভাল।

'বড় ঐ নৌকাটা কার?'

'বছিরের নৌকা।'

'বছিরকে বলিস ওর নৌকা নিয়ে যাচ্ছি। আমার বাড়ির ঘাটে নৌকা যাবে, আমাদের নামিয়ে দিয়ে তারপর চলে আসবে।'

'বলাবলির কিছু নাই বড় সাব — লইয়া যান।'

'তোদের কারোর সঙ্গে যাবার দরকার নেই — আমার মাঝি আছে।'

'জ্বে আচ্ছা। জ্বে আচ্ছা।'

সবাই ব্যস্ত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে নৌকার পাটাতনে পাটি পেতে দিল। তেল-চিটচিটে দু'টা বালিশ জোগাড় হল। ইরতাজুদ্দিন কাউকে কিছু বলেননি — তারা ডাব কেটে নিয়ে এল। নীতু বলল, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা গ্লাস দিতে পারবেন?

বুড়ো মাঝি বলল, ডাবের পানি গেলাসে ঢাললে গুণ নষ্ট হইয়া যায় গো মা। উপুত কইরা টান দেন।

'উপুত কইরা টান দেন।' কি অদ্ভুত বাক্য! ডাব খেতে গিয়ে ডাবের পানিতে নীতু তার স্কার্টটা পুরো ভিজিয়ে ফেলল —। সবাই তাতে খুব মজা পেল। হাসতে হাসতে এক একজন কুটি কুটি।

নৌকায় উঠা নিয়েও এক কাণ্ড। কাদা ভেঙে নৌকায় উঠতে হয়। বুড়ো মাঝি ছুটে এসে নীতুকে বলল, আম্মা আসেন আপনেরে কোলে কইরা পার কইরা দেই।

এত বড় একটা মেয়ে হয়ে সে কারোর কোলে উঠবে ভাবতেই কেমন লাগে — কিন্তু মানুষটা এমন আগ্রহ করে হাত বাড়িয়েছে — না বলতে নীতুর খারাপ লাগল। বুড়ো মাঝি নীতুকে কোলে নিয়ে খুশি খুশি গলায় বলল — আম্মাজীর শইল্যে কোন ওজন নাই। পাখির মতন শইল।

এটা এমন কোন হাসির কথা না অথচ সবাই হাসছে।

নৌকায় উঠেই নীতু বলল, এরা আপনাকে খুব সম্মান করে। তাই না দাদাজান?

ইরতাজুদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন — না করার কোন কারণ নেই। সবাই তো তোর বাবার মত না।

'বাবার কথায় আপনি কি রাগ করেছেন?'

ইরতাজুদ্দিন জবাব দিলেন না। আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। নৌকা তীর ঘেঁসে ঘেঁসে যাচ্ছে — গ্রামে কি খবর হয়ে গেছে? নানান বাড়ি থেকে বৌ-ঝিরা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একদল ছেলেমেয়ে নৌকার সঙ্গে সঙ্গে তীরে তীরে ছুটছে। নীতুর খুব মজা লাগছে।

নীতু বলল, দাদাজান, আপনি মন খারাপ করে বসে থাকবেন না। আপনার মন খারাপ দেখে আমারও খারাপ লাগছে। দেখেছেন দাদাজান, বাচ্চাগুলি কি মজা করছে?

ইরতাজুদ্দিন অস্পষ্টভাবে কি যেন বললেন। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বললেন — নীতু শোন, আমাদের এই কাঠের দোতলা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। চারদিকে হাওড়, আশেপাশে কোন দোতলা বাড়ি নেই। সারা রাতেই অনেকগুলি বাতি জ্বলে . . .

নীতু তাকিয়ে আছে। দাদাজান কি বলতে চাচ্ছেন সে বুঝতে পারছে না। দাদাজানের কথা শুনতে এখন তার ভাল লাগছে না — ছুটতে ছুটতে যে বাচ্চাগুলি যাচ্ছে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেই তার ভাল লাগছে। এরা এত মজা করছে, আশ্চর্য! একজন আবার ইচ্ছা করে একটু পর পর কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে —।

'নীতু।'

'জ্বি।'

'আমাদের এই বাড়িতে অনেক বড় বড় মানুষ এসেছেন। শেরে বাংলা এ. কে.

ফজলুল হক এসেছিলেন পাখি শিকারে। দেশবন্ধু সি. আর. দাস এসেছিলেন। একবেলা থাকবেন বলে এসে চারদিন ছিলেন। আমার বাবা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন — অনেকের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শান্তিনিকেতন শুরু করেন তখন তিনি তাঁর ফান্ডে পাঁচ হাজার এক টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। সেই সময় পাঁচ হাজার এক টাকা — অনেক টাকা।'

'পাঁচ হাজারের সঙ্গে আবার এক কেন দাদাজান?'

'আল্লাহ বেজোড় সংখ্যা পছন্দ করেন, এই জন্যে দান-টান করলে বেজোড় সংখ্যায় দিতে হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'পাখি শিকারের জন্যে বাবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও দাওয়াত করেছিলেন। উনি পাখি শিকার পছন্দ করেন না বলে আসেননি। উনি খুব সুন্দর একটা চিঠি লিখে জবাব দিয়েছিলেন। সেই চিঠি তোর বাবার কাছে আছে।'

'বাবার কাছে নেই দাদাজান। বাবা সেই চিঠি বাংলা একাডেমীতে দিয়ে দিয়েছেন।'

'তোর বাবার বুদ্ধি বেশি তো — সবকিছুতে মাতব্বরি করবে। ব্যক্তিগত একটা চিঠি বাংলা একাডেমীকে দেয়ার কি আছে? যাই হোক, আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে — আমাদের এই বাড়ি ছিল বিখ্যাত এক বাড়ি — হাওড় অঞ্চলের এই বাড়ি সবার চোখে পড়ে। সেটাই স্বাভাবিক। একাত্তর সনের মে মাসে পাকিস্তানী মিলিটারী যখন গানবোট নিয়ে হাওড় অঞ্চলে ঢুকল তাদের চোখেও এই বাড়ি পড়ল। তারা তো অন্ধ না। তাদের চোখ আছে।

নীতু মনে মনে হাসল। দাদাজান কি বলতে চাচ্ছেন সে এখন বুঝতে পারছে। কিন্তু তাঁকে সে কিছু বুঝতে দিল না — এমন ভাব করল যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ইরতাজুদ্দিন বললেন, ওরা গানবোট নিয়ে আমার বাড়ির ঘাটে ভিড়ল। আমি দেখা করতে গেলাম। ওরা আমার সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করল। আমার বাড়িতে উঠে কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম করতে চাইল। ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত একদল মানুষ বিশ্রাম করতে চাইলে আমি কি বলব — না, বিশ্রাম করা যাবে না? ওরা তো খালি হাতে আসেনি — অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে এসেছে। নিরস্ত্র মানুষের মুখের উপর 'না' বলা যায়, অস্ত্রধারী মানুষের মুখের উপর 'না' বলা যায় না। এই সত্য পৃথিবীর সবাই জানে — শুধু তোর বাবা জানে না। এই জন্যেই তোর বাবাকে আমি শুধু গাধা বলি না, বলি 'শ্রেষ্ঠ গাধা'।

নীতু লক্ষ্য করল, তার দাদাজান অসম্ভব রেগে গেছেন। তাঁর ফর্সা মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে — তিনি অল্প অল্প কাঁপছেন।

ইরতাজুদ্দিন বিলের পানিতে একদলা থু-থু ফেলে বললেন, কেউ বলুক দেখি এই গ্রামের কোন মানুষ মিলিটারী মেরেছে কি-না। কেন মারেনি? আমার জন্যেই মারেনি। এত কিছু তোর বাবা জানে — এটা জানে না? তার কতবড় সাহস — সে সে সে . . .

ইরতাজুদ্দিন কথা শেষ করলেন না, টকটকে লাল চোখে তাকালেন। নীতু কিছু বলবে না বলবে না করেও শান্ত স্বরে বলল, দাদাজান, বাবা আমাদের বলেছেন যে মিলিটারী এই গ্রামের কাউকে মারেনি . . . কিন্তু

'কিন্তু আবার কি?'

'বাবা বলেছেন এই গ্রামের ছ'টা মেয়েকে মিলিটারী ধরে নিয়ে এসেছিল — আমাদের এই বাড়িতেই তাদের রেখেছিল। মিলিটারী চলে যাবার সময় তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। পরে এই মেয়েগুলির আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

ইরতাজুদ্দিন তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। নীতু তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

ঘাটে নৌকা ভিড়েছে। ইরতাজুদ্দিন নামলেন। তাঁর পা খানিকটা টলতে লাগল। ইরতাজুদ্দিন সাহেবের পেছনে পেছনে নীতু নামল। নৌকার মাঝি দু'জন মাথা নিচু করে বসে আছে। একবারও মাথা তুলছে না। তীরে নেমে নৌকার মাথা শক্ত করে ধরা দরকার এ কথাও তাদের মনে নেই।

মাঝিরা নৌকা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে — উত্তরের নৌকা, ঘাটায় নৌকা রেখে আসবে। মাঝিদের একজন অস্পষ্ট গলায় বলল — এক আঙুল মেয়ে কিন্তু কি সাহস! এইটা হইল বংশের গুণ — কত বড় বংশ দেখন লাগব না? জোকের মুখে এক মুঠ লবণ দিয়া দিছে। আচানক ব্যাপার।

১৩

মতি টাকা ধার করেছে। সুদিতে একশ টাকা। সে জানে এই টাকাটা ফেরত দিতে বিরাট যন্ত্রণা হবে। প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা করে দেয়া সহজ কথা না। আসল থেকেই যাবে। আসল আর দেয়া হবে না। কি আর করা — সুন্দর করে একটা গানের আসর করতে টাকা লাগে। আবদুল করিমকে আনতেই একশ টাকা বায়নায় চলে যাবে। হ্যাজাক বাতি লাগবে। গানের দিন বৃষ্টি নামলে সাড়ে সর্বনাশ।

গানের জায়গা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। মতির ইচ্ছা গান রাজবাড়িতে হবে না। রাজবাড়িতে গান হলে গাঁয়ের লোক শুনতে পাবে না। রাজবাড়িতে গান হওয়ার একটাই সুবিধা — বৃষ্টি-বাদলায় কিছু হবে না।

গানের দিন মতি গায়ে কি দেবে তা নিয়েও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সিল্কের হলুদ পাঞ্জাবিটা কনুইয়ের কাছে অনেকখানি ছেঁড়া। সুন্দর করে রিপু না করলে দেখা যাবে। দলের অধিকারী ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরে উপস্থিত হওয়া ভাল লক্ষণ না। এতে দলের উপর আস্থা কমে যায়। সাদা সিল্কের একটা উর্নি থাকলে গলায় ঝুলিয়ে দেয়া যেত। তাতে পাঞ্জাবির হাতার ছেঁড়া ঢাকা পড়ত। তার কোন উর্নি নেই। বিছানার চাদর গলায় ঝুলিয়ে তো আর আসরে নামা যায় না। কাজলদানী খুঁজে বের করে কাজল বানাতে হবে। চোখে কাজল দিতে হবে। তার ওস্তাদ বলেছিলেন — মতি মিয়া শোন আসরে যখন নামবি — চোখে কাজল দিবি, মুখে ছুনু-পাউডার দিবি।। কাঁকই দিয়া সুন্দর কইরা চুল আঁচড়াইবি, যেন আসরে নামলেই পরথম সবে বলে — আঁহা কি সৌন্দর্য! পরথমে দর্শনদারি, তারপরে গুণ বিচারি। আসরে আদব-কায়দার দিকে খিয়াল রাখবি — গানের চেয়ে বড় আদব-কায়দা। আদব-কায়দা চোখে পড়ে — গান পড়ে কানে। চোখ কানের চেয়ে বড়। 'ধুন' রাখিসরে ব্যাটা। এইটা 'ধুন' রাখার বিষয়।

'ধুন' রাখার বিষয় হলেও মতি রাখতে পারছে না। সবকিছুতেই টাকা লাগে। টাকা পাবে কোথায়?

মতি টিনের ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে পাঞ্জাবি বের করল। কুচড়ে মুচড়ে কি হয়ে আছে। সেই তুলনায় পায়জামাটা ভাল আছে। এক জোড়া পাম্প সু দরকার ছিল। পাম্প সু নেই। কিনতে হবে।

কুসুমকে বললে সে কি পাঞ্জাবিটা রিফু করে দেবে না? তাছাড়া এম্নিতেই কুসুমের সঙ্গে দেখা করা দরকার — মোবারক চাচার সন্ধান কিছু পেয়েছে কি না

জানা দরকার। এটা তো আরেক চিন্তার ব্যাপার হল।

কুসুম কলসি নিয়ে পানি আনতে বের হবে এমন সময় মতি উপস্থিত হল। কুসুমের বুক ধ্বক করে উঠল। এই ধ্বক ধ্বক অনেকক্ষণ ধরে করবে তারপর আস্তে আস্তে কমবে। ধ্বকধ্বকানি না কমা পর্যন্ত কথা বলা ঠিক না।

'যাও কোথায় কুসুম?'

'দড়ি কলসি লইয়া বাইর হইছি। কই যাই বুঝেন না?'

'চাচা কি ফিরছে?'

'না, ফিরে নাই।'

'চিডিপত্র দিছে?'

'চিডিপত্রও দেয় নাই — আফনে কি বাপজানের খুঁজ নিতে আইছেন না অন্য বিষয় আছে?'

মতি ইতঃস্তত করে বলল, একটা কাম কইরা দিবা কুসুম?

'কি কাম?'

'পাঞ্জাবির হাতাটা একটু রিফু কইরা দিবা?'

'দেন — দিমু নে।'

'এমন কইরা দিবা যেন সেলাই বুঝা না যায়।'

'চিকন কাম কি আর আমি পারি! আমার হইল সব মোটা কাম।'

'গানের আসর করতাছি। শুক্কুরবার দিবাগত রাত্র।'

'শুনছি।'

'তুমি আসবা কিন্তু।'

'রাজবাড়িতে আমারে কে ঢুকতে দিব?'

'রাজবাড়িতে না — গান হইব গেরামে . . . ।'

কুসুম গম্ভীর গলায় বলল, রাজবাড়ির মাইয়া গেরামে আইস্যা গান শুনব না। গান তো আফনে আমরার জন্য করতাছেন না, তারার জন্য করতাছেন। মাটির উফরে বইস্যা গান শোনার শখ তারার নাই।

মতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, তুমি তারে চিন না বইল্যা এমন একটা বেফাঁস কথা বললা। এই মেয়ে আর দশটা মেয়ের মত না।

'এ আসমান থাইক্যা পড়ছে?'

'হুঁ। আসমান থাইক্যাই পড়ছে।'

কুসুম খিলখিল করে হাসছে। যে ভাবে হাসছে তাতে মনে হয় কাঁখের কলসি না মাটিতে পড়ে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়।

মতি বিরক্ত গলায় বলল, হাস ক্যান?

হাসির ফাঁকে ফাঁকে কুসুম বলল, কেন হাসি আইজ বলব না। কোন একদিন বলব।

'রহস্য কইরা কথা বলবা না কুসুম। রহস্য করা ভাল না।'

'জগৎটার মইধ্যেই খালি রহস্য। রহস্য না কইরা কি করব?'

কুসুম কলসি নিয়ে রওনা হয়েছে। মতি মিয়া যাচ্ছে তার পেছনে পেছনে। কসুম বলল, আপনে পিছে পিছে আসতাছেন ক্যান? মতি থমকে দাঁড়াল। তাই তো, সে কেন পেছনে পেছনে যাচ্ছে? কুসুমের মন খারাপ হল। মতি পেছনে পেছনে আসছিল — এত ভাল লাগছিল কুসুমের! সে নিজেই তা বন্ধ করল। কেন? কেন?

মতি বলল, কুসুম, আমি যাই — পাঞ্জাবিটা ঠিকঠাক কইরা রাখবা।

কুসুম জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল মতি হন হন করে যাচ্ছে। একবার কি সে পেছনে ফিরবে না? পেছন ফিরলেই দেখত কুসুম দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কুসুম পানি না এনেই বাড়িতে ফিরে এল।

মনোয়ারার পেটের ব্যথা সকাল থেকে শুরু হয়েছে। ব্যথা এখন অল্প। ব্যথার লক্ষণ ভাল না। তিনি লক্ষণ দেখেই বলতে পারছেন। অল্প ব্যথাই কিছুক্ষণের ভেতর প্রবল হবে এবং তাঁর জগৎ-সংসার অন্ধকার করে দেবে। তখন বার বার শুধু মনে হবে — ইশ, একটু বিষ কেউ যদি এনে দিত। বিষ খেয়ে শান্তিতে ঘুমানো যেত। মৃত্যু তো ঘুমের মতই।

মনোয়ারা চাপা ব্যথা নিয়ে খাটে বসে আছেন — ভয়াবহ ব্যথার যে সময় তাঁর সামনে তার কথা ভেবে বিষণ্ন বোধ করছেন। তাঁর খুব ইচ্ছা রাজবাড়ির ডাক্তার মেয়েটাকে শরীরটা দেখান। যে মেয়ে দূর্গাকে মৃত্যুর কোল থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। তাকে কি সামান্য ব্যথার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। কিন্তু রাজবাড়ির মেয়েকে খবর দিয়ে এখানে আনেন কি করে? সেটা কিছুতেই সম্ভব না। মেয়েটা প্রায়ই বেড়াতে বের হয়। একা একা পাগলের মত হাঁটে। এ রকম কোন একটা সময়ে সে যদি নিজেই হাঁটতে হাঁটতে চলে আসত!

মনোয়ারা দেখলেন কুসুম ফিরেছে। গেল আর ফিরল, এর মধ্যে পানি আনা হয়ে গেল? না, পানি নিশ্চয়ই আনেনি। তার শরীরে আবার সেই জ্বীন ভর করেছে। তিনি ক্ষীণ গলায় ডাকলেন, কুসুম।

কুসুম দরজা ধরে দাঁড়াল। জবাব দিল না।

'পানি আনছস?'

'না।'

'না ক্যান?'

'ইচ্ছা করছে না এই জন্যে আনি নাই।'

'ঘরে এক ফোটা পানি নাই।'

'ঘরে তো চাউল নাই, টেকাপয়সাও নাই — খালি পানি দিয়া কি হইব — ভাল হইছে পানিও নাই।'

মনোয়ারা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। আহা রে, কি মিষ্টি কি সুন্দর মুখ! এ রকম একটা সুন্দর মেয়ের তিনি কি—না বিয়ে দিতে পারছেন না। মনোয়ারা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন — কুসুমের গলায় পীর সাহেবের হলুদ সূতাগাছা নেই। সূতাগাছা সে কি করেছে? ফেলে দিয়েছে? সে কি জানে না এটা কত বড় অলক্ষণ . . .

মেয়ের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে তাঁর ইচ্ছা করছে না। প্রবল ব্যথায় তাঁর শরীর থর থর করে কাঁপছে। তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এই তীব্র যাতনা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই — তাঁর কেন, কারোরই নেই।

'কুসুম, ও কুসুম।'

'কি?'

'মইরা যাইতাছি রে মা!'

না না, তিনি ভুল বলেছেন। তিনি মরে যাচ্ছেন না — তিনি বেঁচে আছেন এবং অনেক দিন এই ভয়ংকর কষ্ট সহ্য করার জন্য বেঁচে থাকবেন। তাঁর জন্যে মৃত্যু হবে আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

রাজবাড়ির মেয়েটা একবার যদি তাঁকে দেখত! তাঁর মন বলছে মেয়েটা এসে তাঁর পেটে হাত রাখামাত্রই তাঁর ব্যথা কমে যাবে।

'কুসুম, ও কুসুম!'

'হুঁ!'

'রাজবাড়ির মেয়েটারে খবর দিয়া আনবি মা?'

'না।'

'মইরা যাইতাছি রে বেটি, মইরা যাইতাছি।'

'মইরা যাওন তো ভাল মা। মরণের মত শান্তি বাঁচনের মধ্যে নাই।'

ব্যথার ধাক্কা মনোয়ারা আর সহ্য করতে পারছেন না। তিনি কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন। একটু পর পর মৃগী রোগির মত তাঁর শরীর শুধু কাঁপছে। তাঁর চোখ ঘোলাটে। কুসুম বলল, মা, আমি উনারে আনতে যাইতাছি . . . আসব কিনা জানি না।

মনোয়ারা জানেন ঐ মেয়ে আসবে। খবর পাওয়ামাত্র ছুটে আসবে। রাজবাড়িতে থাকলেও ঐ মেয়ে রাজবাড়ির মেয়ে না, সে অন্য এক মেয়ে যে মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারে। এই মেয়েটা এসে তাঁর পেটে হাত রাখলেই তাঁর

ব্যথা কমে যাবে। মনোয়ারা বিড় বিড় করে সূরা ইয়াছিন পড়ার চেষ্টা করছেন। মৃত্যু যদি এসেই থাকে সূরা ইয়াছিন পাঠে মৃত্যুযন্ত্রণা কমে যাবে . . .

মনোয়ারার অনুমান ঠিক হয়েছে। রাজবাড়ির পরীর মত মেয়েটা তাঁর পেটে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, কোথায় ব্যথা বলুন তো?

তিনি ব্যথা কোথায় বলতে পারলেন না। অবাক চোখে কুসুমের দিকে তাকালেন। তারপর তাকালেন পুষ্পের দিকে। পুষ্পের পাশে ফুটফুটে নীতুকেও দেখলেন।

শাহানা বলল, বলুন কোথায় ব্যথা?

একটু আগে তীব্র ব্যথা ছিল এখন তার লেশমাত্র নেই। কি অদ্ভুত কাণ্ড! রাজবাড়ির মেয়ে তার মত হতদরিদ্রের ঘরে উপস্থিত হয়েছে। জানতে চাচ্ছে কোথায় ব্যথা কিন্তু তিনি বলতে পারছেন না। তাঁর লজ্জা লাগতে লাগল। শাহানা বলল, এখন ব্যথা নেই?

'জ্বি না আম্মা।'

'ব্যথাটা যখন উঠে কতক্ষণ থাকে?'

এই প্রশ্নের জবাবও মনোয়ারা দিতে পারলেন না। কতক্ষণ থাকে কে জানে। কখনো মনে রাখার চেষ্টা করেন নি। তীব্র কষ্টের ব্যাপার কে আর মনে করে রাখে?

'মনে করতে পারছেন না, না?'

'জ্বি না আম্মা।'

'ব্যথাটা কি হঠাৎ বাড়ে না আস্তে আস্তে বাড়ে?'

মনোয়ারা অসহায় চোখে তাকাচ্ছেন। কোন জবাব দিতে পারছেন না। তিনি আরেকটা ব্যাপারে খুব অবাক হচ্ছেন। মেয়েটা তার পেটে হাত রেখেছিল, হাত এখনও সরিয়ে নেয়নি।

'এখন বলুন তো ব্যথাটা ভাত খাবার আগে হয় না পরে হয়?'

'আম্মা বলতে পারতেছি না।'

তিনি যে মেয়েটার প্রশ্নের জবাব দিতে পারছেন না — তাতে মেয়েটা রাগ করছে না বরং হাসছে। কি সুন্দর করে হাসছে! আহা রে, এরকম একটা মেয়ে যদি আমার থাকত! মনোয়ারা সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ বললেন, আম্মাজি, আফনের উপর আল্লাহপাকের খাস রহমত আছে। আমার বড় মেয়েটার বিবাহ হইতেছে না। আপনে যদি আমার বড় মেয়েটার জন্য একটু দোয়া করেন তাইলে মেয়েটার ভাল বিবাহ হবে।

শাহানা খিলখিল করে হেসে উঠল। শাহানার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠল নীতু। কুসুম এবং পুষ্প হাসল না। মনে হল তারা দু'জনই লজ্জা পাচ্ছে। শাহানা

বলল, আপনার কি জন্যে ধারণা হল আমার উপর আল্লাহর রহমত আছে?

মনোয়ারা শান্ত গলায় বললেন, আম্মাজি, আপনে দূর্গারে মরণের হাত থাইক্যা টাইন্যা বাইর কইরা আনছেন। আমি পেটের ব্যথায় মইরা যাইতেছিলাম। আপনে পেটে হাত দিছেন সাথে সাথে ব্যথা নাই।

'আপনার ব্যথাটা আলসারের। এইসব ব্যথা হঠাৎ করে আসে আবার হঠাৎ করে যায়। আমি হাত না রাখলেও ব্যথাটা চলে যেত।'

'আম্মাজি, আপনে আমার মেয়েটার জন্যে দোয়া করেন। আমার মন বলতেছে আপনে বললেই আল্লাহপাক শুনবে।'

শাহানা অস্বস্তি বোধ করছে। সে অস্বস্তি দূর করে কুসুমের দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বলল, আপনার এই মায়াবতী মেয়েটার যেন খুব ভাল বিয়ে হয় এই প্রার্থনা করছি। তার বর যেন হয় জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, বিত্তবান ও হৃদয়বান।

নীতু হাসতে হাসতে বলল, তুমি অনেক কিছু বাদ দিয়ে গেছ আপা — ন্যায়বান, কান্তিমান ও দয়ালু।

শাহানা বলল, হ্যাঁ, সে হবে ন্যায়বান, কান্তিমান ও দয়ালু।

মনোয়ারার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি মোটামুটি নিশ্চিত এ জাতীয় একটি ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হতে যাচ্ছে।

শাহানা বলল, আপনার কন্যার বিবাহপর্ব শেষ হল, এখন আসুন আপনার অসুখের ব্যাপার দখি। আমার কাগজ-কলম লাগবে — নোট নেব। কাগজ-কলম আছে?

কুসুম না-সূচক মাথা নাড়ল।

'পুষ্প যাও, কোনখান থকে কাগজ-কলম নিয়ে আস।'

কাগজ-কলম আনতে পুষ্প রাজবাড়ির দিকেই ছুটে গেল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শাহানা অপেক্ষা করছে। এত বড় একটা গ্রাম, কাগজ-কলম আছে এমন কেউ নেই? স্কুল, মাদ্রাসা মক্তব কিছুই নেই? জায়গাটা কি সত্য পৃথিবীর বাইরে?

১৪

গানের আসর বসেছে। মঞ্চ তৈরি হয়েছে। রইসুদ্দিনের বাংলাঘরের দর্মার বেড়া সরিয়ে তৈরী হয়েছে মঞ্চ। চারদিক খোলা, উপরে টিনের ছাদ। দু'টা হ্যাজাক বাতি উপর থেকে ঝুলছে। চাটাই পেতে গায়কদের ও বাজনাদারদের বসার ব্যবস্থা। যাত্রার মঞ্চের মত মঞ্চ — চারদিকেই দর্শক।

দর্শকদের বসার কোন ব্যবস্থা নেই। যে যেখানে পেরেছে বসেছে। শাহানা ও মিতুর জন্যে চেয়ার এসেছে। সেই চেয়ার পাতা হয়েছে বাঁশের চাটাইয়ের উপর। প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। শুধু শাহানাদের চারপাশ খালি। এদের আশেপাশে কেউ বসছে না। মঞ্চের দক্ষিণ দিকের একটা অংশ মেয়েদের জন্যে আলাদা করা। সেখানে গাদাগাদি ভিড়। এই ছোট্ট গ্রামে এত মানুষ আছে শাহনা ভাবেনি। রীতিমত জনসমুদ্র। মাইক নেই — সবাই কি শুনতে পারবে? দু'বোন কৌতূহলী চোখে চারদিক দেখছে — তাদের পায়ের কাছে পুষ্প। আনন্দ ও উৎসাহে সে ঝলমল করছে। পুষ্প ধারাবর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে।

'ঐ যে বুড়া লোকটা দেখতাছেন আপা — উনার নাম পরাণ। পরাণ ঢোলী — পিথিমীর মইধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

শাহনা হাসিমুখে বলল — শিল্পীদের মধ্যে 'পিথিমীর শ্রেষ্ঠ' আর কে কে আছে?

'করিম সাব আছে — ঐ যে মোটাগাটা। বেহালা বাজায়। বেহালার ওস্তাদ কারিগর।'

নীতু বলল — একটা লোক যে ঘুমাচ্ছে ও কে?

'আমরার গেরামেরই — তাল দেয়। মন্দিরা দিয়া তাল দেয়।'

'সে ঘুমাচ্ছে কেন?'

'ঘুমাইতাছে না আপা, চোখ বন্ধ কইরা আছে।'

'কেন? চোখ বন্ধ করে আছে কেন?'

'শইলডা মনে হয় ভাল না আপা।'

'শরীর খারাপ নিয়ে গান করতে এসেছে কেন?'

শাহানা বলল, চুপ কর্ তো নীতু — তুই বড্ড পেঁচাতে পারিস। চুপ করে গান শোন।

'গান তো শুরু হয়নি যে শুনব।'

পুষ্প উৎসাহের সঙ্গে বলল, অক্ষন শুরু হইব। আপা, পরথম হইব বন্দনা তারপর গান। আমার কুসুম বুবু আসছে। ঐ দেহেন একলা একলা বইস্যা আছে —।

নীতু বলল, আমাদের কাছে এসে বসতে বল।

'বইল্যা লাভ নাই, আসব না।'

শাহানা তাকাল। কুসুমের সঙ্গে আগে দু'বার দেখা হলেও এখনকার আলো-আধারীতে তাকে চেনা যাচ্ছে না। অন্য রকম লাগছে।

নীতু বলল, মেয়েটা কি মিষ্টি দেখেছ আপা?

শাহানা হাসতে হাসতে বলল, 'পিথীমীর শ্রেষ্ঠ মিষ্টি'।

নীতু খিলখিল করে হাসছে। পুষ্পও হাসছে। কুসুম হাসির শব্দে সচকিত হয়ে ওদের দিকে তাকাল। তারপরই উঠে গিয়ে ভিড়ের ভেতর মিশে গেল। আজ সে খুব সেজেছে। চোখে কাজল দিয়েছে। পায়ে আলতা দিয়েছে। লম্বা চুলে সুন্দর বেণী। পুষ্প বলল, হারমনি বাজাইব যে লোকটা তার নাম কুদ্দুস। হে তিনটা বিয়া করছে।

নীতু বলল, কেন?

শাহানা বলল, চুপ কর তো নীতু, ও তিনটা বিয়ে করেছে কেন সেটা পুষ্প কি করে বলবে?

'লোকটাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করব আপা?'

'তুই বড্ড যন্ত্রণা করিস নীতু।'

নীতু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ অতিরিক্ত রকম উৎসাহের সঙ্গে বলল, আপা দেখ দেখ। আমাদের গায়ক মতি মিয়াকে দেখ। দেখছ?

'হুঁ।'

পুষ্প বলল, মতিভাই গানের দল করছে।

নীতু বলল, গানের দল করলে এরকম বিশ্রী রঙের পাঞ্জাবি পরতে হবে? আপা, পাঞ্জাবিটার দিকে তাকালে বমি এসে যায় না?

'বমি না আসলেও চোখ কট কট করে। পিথিমীর নিকৃষ্ট হলুদ রঙ।'

'আপা, ভদ্রলোক আমাদের দিকে আসছেন। সর্বনাশ হয়েছে! হয়ত তোমাকে সভাপতি হবার জন্যে অনুরোধ করবেন।'

'গ্রামের অনুষ্ঠানে সভাপতি-টতি হবার নিয়ম নেই।'

'তাহলে আসছেন কেন?'

পুষ্প বলল, আফনাদের জইন্যে পান আনতাছ।

নীতু অবাক হয়ে বলল, পান আনবে কেন? আমরা তো পান খাই না। না-কি গানের আসরে এলে পান খেতে হয়?

মতি কাঁসার বাটিতে বানানো খিলিপান এনে অতি বিনয়ের সঙ্গে শাহানার সামনে

টেবিলে রাখল। শাহানা সঙ্গে সঙ্গে এক খিলি পান তুলে নিল।

নীতু বলল, আপনি এই কুৎসিত পাঞ্জাবিটা কেন পরেছেন? কটকটা হলুদ রঙের পাঞ্জাবি কেউ পরে? ও কি, চোখে কাজল দিয়েছেন না-কি?

মতি বিব্রত গলায় বলল, গাওনার দিন সাজসজ্জা করা আমার ওস্তাদের আদেশ।

নীতু গম্ভীর গলায় বলল, আপনার ওস্তাদকে বলবেন তাঁর আদেশ মানার জন্যে আপনাকে ভূতের মত লাগছে। আর কাজলও তো ঠিকমত দিতে পারেননি — এক চোখে বেশি এক চোখে কম . . .

শাহানা নীতুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনাদের অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে?

'আফনের দাদাজান আইলেই শুরু হইব। উনি এই অঞ্চলের পরধান। উনারে ছাড়া শুরু করণ যায় না।'

'উনি আসবেন না। শুরু করে দিন। অনুষ্ঠান চলবে কতক্ষণ?'

'সারারাইত ধইরা চলব।'

'সে কি?'

'গেরাম দেশের আসরের এইটাই নিয়ম। মসজিদে ফজরের আজান হইব — গাওনা শেষ।'

শাহানা বলল, নীতু তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে। তারচেয়েও বড় কথা, আকাশের অবস্থা দেখেছেন — বৃষ্টি নামবে। দেরি না করে শুরু করে দিন।

অনুষ্ঠান শুরু হল বাজনা দিয়ে। মূল বাদক পরাণ। সে ঢোলে বোল তুলল। মনে হচ্ছে সে বাজিয়ে ঠিক আরাম পাচ্ছে না — নড়াচড়া করছে — ঢোলের জায়গা বদলি করছে। কখনও রাখছে বাঁপাশে, কখনও সরিয়ে নিয়ে আসছে ডানপাশে। ঢোলের সঙ্গে যুক্ত হল — খঞ্জনী, তার সঙ্গে বাঁশি। পরাণ ঢোলী তাপরেও স্বস্তি পাচ্ছে না — বার বার কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সম্ভবত তার কোন সমস্যা হচ্ছে।

আবদুল করিম ভুরু কুঁচকে পান চিবাচ্ছিল। বেহালা তার কোলের উপর রাখা। থু করে মুখের পান ফেলে দিয়ে বেহালা কাঁধে তুলে নিল। বেহালার ছড় কপালে ছুঁইয়ে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপরই হঠাৎ যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। পরাণ ঢোলীর অস্বস্তি দূর হল। খঞ্জনীবাদক শীরদাঁড়া সোজা করে বসল, বাঁশিওয়ালা তার বাঁশি বদলে নতুন বাঁশি নিল।

নীতু বলল, আপা, এরা কি অদ্ভুত বাজনা বাজাচ্ছে দেখেছ?

শাহানা চুপ করে রইল — বাজনা না, একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যে ঝড়ের উদ্দেশ্য মনের উপর চাপা পড়ে থাকা ধুলা-ময়লা-আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। সব ঝড়ের সঙ্গেই বৃষ্টি থাকে, বৃষ্টি মানেই কান্না। বাজনার এই ঝড়েও কান্না আছে। গভীর, গোপন কিন্তু তীব্র কান্না। সেই কান্নার দায়িত্ব নিয়েছে — বেহালা ও বাঁশি। ঢোল হচ্ছে

ঝড়, বেহালা হচ্ছে বৃষ্টি।

পরাণ ঢোলী বসে ঢোল বাজাচ্ছিল। হ্যাঁচকা টানে সে ঢোল কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল বেহালাবাদক আবদুল করিম।

নীতু উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বলল — আপা, দেখ কি অদ্ভুত করে ওরা নাচছে। শাহানা আশ্চর্য বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। নৃত্যের উত্তেজনা, ঢোলের তাল, বেহালার তীব্র সুরের ছোঁয়া লেগেছে দর্শকের মনে। চারদিকে বাজনার শব্দ ছাড়া সুনসান নীরবতা। কেউ মনে হয় নিঃশ্বাসও ফেলছে না।

নীতু ফিস ফিস করে বলল, আমারো নাচতে ইচ্ছা করছে আপা।

শাহানা ভাবছে, এই বাজনা তার কাছে যত সুন্দর লাগছে আসলেই কি তা তত সুন্দর, না-কি বিশেষ এই পরিবেশ তাকে অভিভূত করছে? নিস্তব্ধ গ্রাম, মেঘে ভরা আকাশ — দূরের হাওড় সবকিছুই বাজনায় অংশগ্রহণ করছে বলেই কি এমন লাগছে?

যতই সময় যাচ্ছে বাজনা ততই উদ্দাম হচ্ছে — ঢোলবাদক তার ঢোলকে বিশেষ একদিকে মোড় নেওয়ানোর চেষ্টা করছেন। বেহালাবাদক এবং বংশিবাদকের বিস্মিত দৃষ্টি বলে দিচ্ছে ঢোলে কিছু একটা হচ্ছে যা ধরাবাধা নিয়মের বাইরে . . .। তারা বিপুল উৎসাহে নতুন করে শুরু করল — । শাহানা তার শরীরে এক ধরনের কাঁপন অনুভব করল। শরীরের ভেতরে যে শরীর আছে সেই শরীরে কিছু একটা হচ্ছে।

গান শুরু হল মাঝরাতে। ততক্ষণে নীতু ঘুমিয়ে পড়েছে। সে ঘুমুচ্ছে শাহানার কোলে মাথা রেখে। আকাশে মেঘ আরো বাড়ছে। গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে।

মতি আকাশের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে একবার তাকিয়েই গান ধরল —

মরিলে কান্দিও না আমার দায়
ও যাদুধন।
মরিলে কান্দিও না আমার দায়

ও আমার প্রিয়জন আমার মৃত্যুতে তুমি কেঁদো না। তুমি বরং কাফন পরাবার আগে আগে সুন্দর করে সাজিয়ে দিও। গান শুরু হল খালি গলায়। তার সঙ্গে যুক্ত হলো হারমোনিয়াম, বেহালা ও বাঁশি। কি অপূর্ব গলা — ভরাট, মিষ্টি, বিষাদ মাখা। কিছুক্ষণ আগের উদ্দাম বাজনার স্মৃতি গতিক মতি মিয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল। তীব্র এক বিষাদ মতি মিয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই বিষাদ পৃথিবীর বিষাদ নয়। এই বিষাদ অন্য কোন ভুবনের।

শাহানা স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেল মানুষটি মরে পড়ে আছে — তার অতি প্রিয়জন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সেই কান্না ছাপিয়ে গান হচ্ছে —

মরিলে কান্দিও না আমার দায়
ও যাদুধন
মরিলে কান্দিও না আমার দায় . . .

সাধারণ একজন গ্রাম্য গায়ক — সাধারণ সুর অথচ কি অসাধারণ ভঙ্গিতেই না সে জীবনের নশ্বরতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মনের গভীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে নগ্ন হাহাকার। শাহানার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল। কেউ কি তাকে দেখছে? দেখুক। তার নিজেরও গায়কের সঙ্গে কেঁদে কেঁদে গাইতে ইচ্ছা করছে —

মরিলে কান্দিও না আমার দায়
ও যাদুধন।
মরিলে কান্দিও না আমার দায় . . .॥

১৫

গান ভোররাত পর্যন্ত হবার কথা — বৃষ্টির জন্যে সব এলোমেলো হয়ে গেল। অল্পসল্প বৃষ্টি হলে একটা কথা ছিল — আষাঢ় মাসের মুষল ধারার বৃষ্টি। আসর ভেঙে দেয়া ছাড়া গতি কি?

মতি খুব মন খারাপ করে ভিজতে ভিজতে ঘরে ফিরেছে। ঘরে পৌঁছার পর মনে হয়েছে কেরোসিন নেই, হারিকেন জ্বালানো যাবে না। আজ বিকেলেই বোতলের সবটুক কেরোসিন হ্যাজাক লাইটে ভরতে হয়েছে। ঘরের জন্যে আর কেনা হয়নি।

ভেজা কাপড় বদলানোর জন্যে শুকনো কাপড় খুঁজে বের করতে হবে। অন্ধকারে এই কাজটা করা সম্ভব না। পাঞ্জাবির পকেটে রাখা দেয়াশলাই ভিজে চুপ চুপ করছে। ঘরে আর কোন দেয়াশলাই আছে বলেও মনে হয় না।

আলোর চেয়েও বড় সমস্যা — অসম্ভব খিদে লেগেছে। ভর-পেটে গান গাইতে ওস্তাদের নিষেধ আছে। মতি ভর-পেটে গানের আসর করে না। সে দুপুরে খেয়েছিল তারপর আর কিছু খায়নি। খিদেয় শরীর ভেঙে আসছে। প্রচণ্ড ঝাল কোন তরকারি দিয়ে গরম গরম ভাত খেতে ইচ্ছা করছে। তরকারি না হলেও ক্ষতি নেই — গরম ভাত হলেও হবে। শুকনো মরিচ ভেজে, পেঁয়াজ তেল মাখিয়ে একটা ভর্তা বানাতে পারলে সেই ভর্তামাখা ভাত খেতে হবে অমৃতের মত। ভাত রাঁধার উপায় নেই। আগুন নেই। থাকলেও রাঁধতে ইচ্ছা করবে না। শরীর ঝিম ঝিম করছে — জ্বর আসবে হয়ত। শরীর অশক্ত হয়ে পড়েছে, অল্পতেই জ্বরজারি হয়। গান-বাজনা পরিশ্রমের কাজ। শরীর ঠিক না থাকলে গান-বাজনা হয় না। মতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল — শরীর ঠিক রাখবে কি ভাবে — দু'বেলা খাওয়াই জুটে না।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শুকনো লুঙ্গি বের করল, গেঞ্জি বের করল। কাঁথা বের করে গায়ে দিল — শীত লাগছে। গায়ে কাঁপন ধরেছে।

খিদের জন্যে শরীর ঝিম ঝিম করছে। চিড়া বোধ হয় আছে। কয়েক মুঠো শুকনো চিড়া চিবিয়ে পানি খেয়ে শুয়ে থাকা যায়। শরীর যদিও ভাত ভাত করছে। করলে তো লাভ হবে না। সবই আল্লাহ্‌পাকের নির্ধারণ করা। তিনি যদি ঠিক করে রাখেন দু' মুঠো শুকনো চিড়া তাহলে শুকনো চিড়াই খেতে হবে। উপায় কি!

অন্ধকারে মতি যে হাড়িতে চিড়া রাখা ছিল সেই হাড়ি খুঁজে পেল না। ভালই

হল। খিদে-পেটে ঘুম আসে না — কিন্তু খিদে প্রচণ্ড হলে ভাল ঘুম হয়। রাতটা পড়েছে ঘুমের।

গান গেয়ে মতি আজ খুশি। সে জানে সে ভাল গেয়েছে। এইসব জিনিশ কাউকে বলে দিতে হয় না। বোঝা যায়। নিজের মনই নিজেকে বলে দেয়। রাজবাড়ির মেয়ে দু'টির গান ভাল লেগেছে কি-না কে জানে। মনে হয় লাগেনি। গানের মাঝখানে দু'জন উঠে গেল। মতি সবচে' ভাল যে গানটি গেয়েছে সেটা শুনে যেতে পারল না।

তুই যদি আমার হইতি
আমি হইতাম তোর —
কোলেতে বসাইয়া তোরে করিতাম আদর . . .

এই গান তারা না শোনায় ভালই হয়েছে। এই গানের মর্ম শহরের মানুষের বোঝার কথা না। সবার জন্য সব জিনিশ না . . .

'মতি জাগনা আছ?'

'কে?'

'আমি। আমি জয়নাল।'

মতি দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। ছাতি মাথায় জয়নাল উঠোনে দাঁড়িয়ে। তার হাতে হারিকেন। অন্য হাতে গামছা বাঁধা এলুমিনিয়ামের গামলা।

'বিষয় কি জয়নাল?'

'ভাত আনছি।'

মতি বিস্মিত হয়ে বলল, ভাত?

'হ ভাত। কুসুম পাঠাইছে। গান শেষ হইতেই কুসুম কইল — জয়নাল ভাই, আমারে এটু আগাইয়া দেন। আগাইয়া দিলাম। শেষে কইল, মতি ভাইয়ের জন্যে ভাত লইয়া যান।'

মতির প্রাথমিক বিস্ময় কেটে গেল। এর আগেও কুসুম গানের শেষে ভাত পাঠিয়েছে। সে জানে, মতি খালি পেটে গান গাইতে আসরে উঠে। গান শেষে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমুতে যায়।

জয়নাল দাওয়ায় ভাতের গামলা নামিয়ে রাখল। মতি বলল, হারিকেন থুইয়া যাও জয়নাল — আমার ঘরে বাত্তি নাই। আইজ গান কেমন হইছে?

জয়নাল উৎসাহের সঙ্গে বলল, দুর্দান্ত গান হইছে মতিভাই। গলা একখান আল্লাহ্‌পাক আপনেরে দিছিল। সোনা দিয়া এই গলা বান্ধাইয়া রাখন দরকার। কুসুমেরও গান খুব মনে ধরছে।

'বলছে কিছু?'

'বলছে — মতিভাই আইজ গান গাইয়া মাইনষের চউক্ষে পানি আনছে।

মতিভাইয়ের কপালে অনেক দুঃখ।'

'এই কথা বলল ক্যান?'

'কুসুমের কি মাথার ঠিক আছে — যা মনে অয় কয় — তয় মতিভাই, জব্বর গান হইছে — পিথিমীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। খাইতে বসেন — ভাত গরম আছে।'

'তুমিও চাইরডা খাও আমার সাথে জয়নাল।'

'না না — আফনে খান। আমি যাইগা — বিষ্টি কি নামছে দেখছেন মতিভাই ... ?

'হুঁ।'

'পিথিমী না ডুইব্যা যায়!'

উঠোনে পানি জমে গেছে। পানিতে থপ থপ শব্দ তুলে জয়নাল চলে গেল। মতি খেতে বসল। গরম ভাত, ডিমের তরকারি, বেগুন ভর্তা, ডাল — এক্কেবারে রাজা-বাদশার খানা।

খেতে খেতে মতির মনে হল — আজ সে আসলেই ভাল গেয়েছে। ভাল গেয়েছে বলেই আল্লাহ্পাক তার কপালে লিখেছেন — গরম ভাত, ডিমের ঝোল — তাকে তিনি অনাহারে ঘুমুতে দেননি। কুসুম কেউ না — সে শুধুই উপলক্ষ, উছিলা। আল্লাহ্পাক সরাসরি কিছু করেন না — যা করার উছিলার মাধ্যমে করেন।

১৬

মিতু,

তুই কেমন আছিস বল তো?

আমি জানি তুই আমার উপর খুব রাগ করে আছিস। তোর কত শখ আমরা তিন বোন মিলে গ্রামে এসে গিয়ে হৈ-চৈ করব। আমার জন্যে তোর শখ মিটল না। মিতু, খুব ছোটবেলা থেকেই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম — এ জীবনে কাউকেই কখনো কষ্ট দেব না। দেইও না, শুধু তোর বেলাতেই ব্যতিক্রম হয়। কেন হয় আমি নিজেও জানি না। কেন তোকে আমি বারবার কষ্ট দেই? তুই আমার অতিপ্রিয় এই কারণেই কি? অতি প্রিয়জনদেরই কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে।

আজ আমার মনটা খুব খারাপ। এখানে একটা গানের আসর হল। হেলাফেলা ভাব নিয়ে গান শুনতে গিয়ে রীতিমত চমকে গেছি। প্রথমে কিছুক্ষণ বাজনা হল – গ্রাম্য কনসার্ট। একজন নেচে নেচে ঢোল বাজালেন, বাকিরা তাকে সঙ্গত করলেন। আমি বাজনা শুনে অভিভূত হয়েছি এটা বললে কম বলা হবে — আমার চিন্তা-চেতনায় একটা ধাক্কা পড়েছে।

কনসার্টের পর শুরু হল গান। এই গ্রামেরই এক গায়ক মতি মিয়া গান শুরু করলেন। বেচারার চোখে কাজল, গায়ে হাস্যকর এক পাঞ্জাবি, যার হাতা ছেঁড়া। রিফু করে সে ছেঁড়া ঢাকা যায়নি। সে হাসিমুখে দর্শকদের মাথা নুইয়ে কয়েকবার সালাম করে গান শুরু করল — মরিলে কান্দিও না আমার দায় — সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেল। মিতু গানের এই প্রচণ্ড শক্তির কথা আমার জানা ছিল না। বাসায় রাতদিনই গান শুনি। ঘরভর্তি এল. পি. — সিডি ডিস্ক। গান শুনে কতবার অভিভূত হয়েছি — চোখে পানি এসেছে কিন্তু গ্রামের আসরের গ্রাম্য সেই গায়কের গান শুনে চোখে যে পানি এসেছে তার জাত আলাদা। এই গায়ক তার গান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন — মানব জীবন ক্ষণিকের। ডাক্তার হিসেবে এই তথ্য আমার অজানা নয় তারপরেও মনে হল — জীবনে এই তথ্যটির মর্ম প্রথম উপলব্ধি করলাম।

গান শুনতে শুনতে আমার কি ইচ্ছা হচ্ছিল জানিস? আমার ইচ্ছা হচ্ছিল চেয়ার ছেড়ে মঞ্চে উঠে যাই। গায়কের পাশে গিয়ে বসি। গায়ককে বলি — শুনুন, আপনি

কোন দিন আমাকে ছেড়ে যেতে পারবেন না। আপনাকে আমৃত্যু আমার পাশে পাশে থাকতে হবে। আপনি কোনদিনও আর আসর করে গান গাইতে পারবেন না — বাকি জীবন আপনাকে গান গাইতে হবে শুধুই আমার জন্যে।

তুই কি ভাবছিস আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ঘোরের মত তৈরি হয়েছে তো বটেই। এই ঘোর সামাল দেবার ক্ষমতাও আমার আছে। যে মেয়ে দু'দিন পর জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ. ডি. করতে যাবে সে এক অশিক্ষিত মূর্খ গ্রাম্য গায়ককে কখনো বলতে পারবে না — আপনি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবেন না। বলতে পারা উচিতও বোধহয় না। ঐ গ্রাম্য গায়ক একটা বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। ঐ বিদ্যার ক্ষমতা সম্পর্কেও তার ধারণা নেই। ঐ বিশেষ বিদ্যাটির প্রতি ভালবাসা তার দিকে নিয়ে যাওয়া কোন কাজের কথা না।

কিন্তু মিতু, আমি এতই অভিভূত হয়েছি যে আমার মন শুধুই কাঁদছে — । বার বার মনে হচ্ছে, আমি যদি এই গ্রামের অশিক্ষিত দরিদ্র এক তরুণী হতাম — তাহলে কি চমৎকার হত! ছুটে যেতাম তাঁর কাছে। হায় রে! আমার জন্ম হয়েছে অন্য জগতে — আমি রাজবাড়ির মেয়ে — ভীরু ধরনের মেয়ে, যার সাহস ঢাকা থেকে একা একা সুখানপুকুরে উপস্থিত হবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে যাবার ক্ষমতা যার নেই। প্রতিভার প্রাথমিক পর্যায় চারাগাছের মত। সতেজ ছোট্ট একটা চারাগাছ যে লক লক করে বেড়ে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাকে সযত্নে রক্ষা করতে হয়। তারপর এক সময় সে মহীরুহে পরিণত হয়, তখন আর তার কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। আচ্ছা মিতু, আমি কি . . . না থাক।

মিতু, তুই চলে আয়। আমার খুব একা একা লাগছে। শরীরটাও ভাল নেই — গানের আসর থেকেই জ্বর জ্বর ভাব নিয়ে ফিরেছি। দেখতে দেখতে জ্বর বেড়েছে। শারীরিক অবস্থাও ঘোর তৈরির একটি কারণ হতে পারে . . .। তুই চলে আয় মিতু — তোকে নিয়ে দু'-একদিন খুব বেড়াব, তারপর ঢাকায় চলে আসব। নিজের ভুবনে — নিজের জগতে। বাইরের কোন কিছুই তখন আর আমাকে আহত করতে পারবে না। আমরা আধুনিক মানুষ — কচ্ছপের মত শক্ত খোলের ভেতর থাকাই আমাদের জন্যে নিরাপদ।

কান্নার শব্দ আসছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে। চিঠি লেখা বন্ধ করে শাহানা উঠে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে নীতু কাঁদছে। এরকম করে সে কাঁদছে কেন? আশ্চর্য তো!

শাহানা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নীতু না, কাঁদছে পুষ্প। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নীতু পুষ্পের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নীতুর মুখ বিষণ্ন।

শাহানা বলল, কি হয়েছে নীতু?

নীতু জবাব দিল না। শাহানা পুষ্পের দিকে তাকিয়ে বলল, পুষ্প, কি হয়েছে?

পুষ্প বলল, কিছু হয় নাই।

'অকারণে কেউ তো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। কি হয়েছে তুমি কি বলতে চাও না?

পুষ্প না-সূচক মাথা নাড়ল। শাহানা লক্ষ্য করল, পুষ্পের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। নীতু বলল, দাদাজান ওকে মেরেছেন। চড় মেরেছেন।

'ও আচ্ছা।'

নীতু বলল, ওকে চলে যেতে বলেছেন। ও চলে যাচ্ছে।

শাহানা নিজের ঘরে চলে এল। সমস্যা কিছু হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। নীতুর মুখ কঠিন হয়ে আছে। এই মুখ বিদ্রোহিনীর মুখ। সে নিজেকে সামলে রাখতে চেষ্টা করছে।

এমন মানসিক পরিস্থিতিতে চিঠিতে মন বসানো যায় না। শাহানা নিজের ঘরের বিছানায় বসল। সে ভেবেছিল, কিছুক্ষণের মধ্যে নীতু ঘরে ঢুকে পুরো ব্যাপারটা বলবে।

নীতু ঘরে ঢুকল না। কি হয়েছে কিছু জানা যাচ্ছে না। দাদাজান মেরেছেন, অকারণে নিশ্চয়ই মারেননি। একজন বৃদ্ধ সুস্থ মাথার মানুষ অকারণে শিশুর গায়ে হাত তুলবেন না। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা সামান্যই। ইরতাজুদ্দিন সাহেব বাংলোঘরের জানালা থেকে দেখেছেন পুষ্প নীতুর হাত ধরে হাঁটছে। কি সব বলছে, নীতু হেসে ভেঙে পড়ছে। তিনি পুষ্পকে ডেকে পাঠালেন। নীতুও সঙ্গে সঙ্গে এল। নীতুকে তিনি চলে যেতে বললেন। নীতু গেল না, দাঁড়িয়ে রইল। তিনি পুষ্পের চোখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সহজ গলায় বললেন — কি রে, তুই নীতুর হাত ধরে হাঁটছিস কেন? এক ফোঁটা শরীরে এত সাহস! বলেই কারো কিছু বুঝবার আগে প্রচণ্ড চড় কষালেন। পুষ্প এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না বলে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। ইরতাজুদ্দিন আরো সহজ গলায় বললেন — কাঁথা-বালিশ নিয়ে বাড়ি চলে যা। আর যেন তোকে এ বাড়িতে না দেখি।

এখন বিকেল। রোদ মরে এসেছে। নীতুর খুব একা একা লাগছে। পুষ্প নেই। সে তার মাদুর ও বালিশ না নিয়েই চলে গেছে। নীতু আপন মনে খানিকক্ষণ বারান্দায় হাঁটল, তারপর গল্পের বই নিয়ে বাড়ির পেছনের বাগানে চলে গেল। সেখানে কাঁঠালগাছে বড় দোলনা টানানো হয়েছে। দোলনায় দোল খেতে খেতে গল্পের বই পড়া যায়। সঙ্গে আনা বই সব পড়া হয়ে গেছে। নীতু পুরানো একটা বই — "জল

দস্যু" নিয়ে দোলনায় উঠে বসল। সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্পের বই পড়ল।

সন্ধ্যা মেলাবার পর শাহানার ঘরে ঢুকে বলল, আপা, পুষ্প তো চলে গেছে, আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে ঘুমুব।

শাহানা বলল, আচ্ছা।

'আমরা আর ক'দিন আছি আপা?'

'চারদিন। তোর কি চলে যেতে ইচ্ছা করছে?'

'না, চারদিন পরই যাব।'

'তোর কি মন বেশি খারাপ?'

'হুঁ।'

'ছাদে যাবি? চল ছাদে বসে গল্প করি। যাবি?'

'হুঁ যাব। দাঁড়াও, এক মিনিট। দাদাজানকে একটা কথা বলে আসি।'

'রাগারাগি করবি না তো?'

'না।'

'খবরদার! রাগারাগি করবি না। আমি কি আসব তোর সাথে?'

'উহুঁ।'

ইরতাজুদ্দিন নামাজঘরে বসেছিলেন। মাগরিবের নামাজ শেষ করে তসবি টানছেন। নামাজঘরে মোমবাতি জ্বলছে। মশা তাড়াবার জন্যে ধূপ জ্বালানো হয়েছে। ধূপের গন্ধে গা কেমন কেমন করে। নীতু নামাজঘরে ঢুকল না। দরজা ধরে দাঁড়াল। ইরতাজুদ্দিন তসবি নামিয়ে রেখে বললেন, কিছু বলবি?

নীতু বলল, হ্যাঁ।

'বল শুনি।'

নীতু খুব স্পষ্ট করে বলল, দাদাজান, আপনি অকারণে পুষ্প মেয়েটাকে মেরেছেন। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। খুব অন্যায় করেছেন।

ইরতাজুদ্দিন শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, মানুষ হয়ে জন্মালে এইসব ছোটখাটো অন্যায় করতে হয়। পশুরাই শুধু কোন অন্যায় করে না। আমি তো পশু না। আমি মানুষ।

'দাদাজান, অন্যায় করেছেন। আমি প্রচণ্ড রকম রাগ করেছি আপনার উপর। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মেয়েটিকে ডেকে ক্ষমা না চাইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ বাড়ির কোন খাবার খাব না।'

'তাই না-কি?'

'হ্যাঁ তাই।'

নীতু দরজার পাশ থেকে সরে এল। ইরতাজুদ্দিন ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব দিলেন

না। বাচ্চা একটা মেয়ের কথায় গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। এক বেলা না খেলে কিছু হয় না। তিনি আবারো তসবি টানতে লাগলেন।

নীতু ছাদে বসে শাহানার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল। মজার মজার গল্প। একবার তাদের স্কুলে এক বানরওয়ালা বানরের খেলা দেখাতে এসেছিল — বানরটা হঠাৎ ছুটে এসে নাইন বি সেকশানে ঢুকে কি কাণ্ডকারখানা শুরু করল। তিথি নামে একটা মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরল। মেয়ে চিৎকার দিয়েই অজ্ঞান। গল্প শেষ করে রান্নাঘরে ঢুকে রমিজের মা কি করে কুমড়ো ফুলের বড়া তৈরি করে সেটা আগ্রহ করে দেখল।

রাতে ঘুমুতে গেল না খেয়ে।

১৭

মনোয়ারার মনে সকাল থেকে কু ডাকছিল। মনে হচ্ছিল আজ ভয়ংকর কিছু ঘটবে। কেউ খুব খারাপ কোন খবর নিয়ে আসবে। বিব্রত গলায় সেই খারাপ খবর দিয়ে বলবে — "সবই আল্লাহপাকের ইচ্ছা। আল্লাহপাক যা করেন মানুষের মঙ্গলের কথা চিন্তা কইরা করেন। উনি পরম দয়ালু রাহমানুর রহিম।" যদিও মনোয়ারা তাঁর জীবনে আল্লাহ্‌র পরম দয়ার তেমন কোন পরিচয় পাননি। তাঁর কাছে প্রায়ই মনে হয় — আল্লাহ খুব কঠিন হৃদয়ের কেউ — মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে বিচলিত করে না। তাঁর বিশাল সৃষ্টিজগৎ। মানুষের মঙ্গল নিয়ে চিন্তা-ভাবনার তাঁর সময় কোথায়? যার সামান্য ইশারায় জগৎ সৃষ্টি হয়, তাঁর ইচ্ছা হলেই সমগ্র মানবজাতির দুঃখ-কষ্ট দূর হবার কথা। তা তো হয় না — মানুষের দুঃখ কষ্ট শুধুই বাড়ে — শুধুই বাড়ে।

মনোয়ারা উঠোনে বসে আছেন। পুষ্প তাঁর মাথার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। পুষ্পের মুখও শুকনো। সে কাল রাতে রাজবাড়ি থেকে চলে এসেছে। সারারাত কেঁদেছে। কি হয়েছে কিছুই বলেনি। মনোয়ারাও জিজ্ঞেস করেননি। তিনি অস্থির তাঁর নিজের চিন্তায়। অন্যের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত তাঁর মনের অবস্থা না। মনোয়ারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে। কাউকে আসতে দেখলেই প্রবল উত্তেজনা বোধ করছেন — কেউ কি আসছে? দুঃসংবাদ নিয়ে ক্লান্ত পায়ে কোন একজন — যে অনেক ভনিতা করে শেষটায় বলবে — "সবই আল্লাহপাকের ইচ্ছা।"

মনোয়ারার বুক ধ্বক করে উঠল, কে যেন আসছে। এখনো অনেক দূরে, তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিন্তু হাঁটার ভঙ্গিটা পরিচিত। মনোয়ারা রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, ও পুষ্প, এইটা কে আসে, তোর বাপজান না?

পুষ্প চুলের বিলি কাটা বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, সেরকমই তো মনে হচ্ছে। উনার পিছনে আরো একজন কে যেন আসছে।

মনোয়ারা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন — পুষ্প, তোর বাপজান না?

পুষ্প বিকট একটা চিৎকার দিয়ে ছুটতে শুরু করল। পুষ্পের চিৎকারে ঘরের ভেতর থেকে কুসুম বের হল। এত বড় মেয়ে কিন্তু হায়াশরম বিসর্জন দিয়ে ছোটবোনের মতই বিকট চিৎকার দিয়ে সেও ছুটতে শুরু করল।

মনোয়ারার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি মুছে ফেললেন। একটু

আগেই তিনি যে আল্লাহর দয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন তার জন্যে তাঁর লজ্জার সীমা রইল না।

রাস্তার উপরই মোবারককে তাঁর দুই মেয়ে জড়িয়ে ধরে ফেলেছে। মোবারক কপট ধমক দিচ্ছেন — তোরা আদবকায়দা কিছুই জানস না — রাস্তার উপরে কি শুরু করছস! ছাড় দেখি ছাড়। আহা রে যন্ত্রণা!

মোবারকের পেছনে লাল শার্ট পরা ছেলেটি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত এমন আবেগঘন মুহূর্ত দেখে তার অভ্যেস নেই। তার তাকিয়ে থাকতে লজ্জা লাগছে, আবার চোখ নামিয়ে নিতেও পারছে না।

মোবারক হাসিমুখে বললেন, সুরুজ, এই দুইটা আমার দুই পাগলা মাইয়া। বড়টার নাম কুসুম, আর ছোটটা পুষ্প।

সুরুজ চোখ নামিয়ে ফেলল, অস্বস্তি নিয়ে কাশল। কুসুমের বুক ধ্বক ধ্বক করে উঠল। সুরুজ নামের এই যুবক এমন ভঙ্গিতে চোখ নামিয়ে নেবে কেন? এমন ভঙ্গিতে কাশবে কেন? বাপজান এই ছেলেকে কেন নিয়ে এসেছে?

মোবারকের সঙ্গে সুরুজের পরিচয় নিন্দালিশ বাজারে। এক কাঠের দোকানে সে পেটে-ভাতে কাজ করে। রাতে দোকানে শুয়ে থাকে। ঘর পাহারা দেয়। বাবা-মা নেই, অনাথ ছেলে। নৌকার জন্যে কাঠ কিনতে গিয়ে ছেলেটাকে তাঁর বড়ই পছন্দ হল। বড়ই নরম স্বভাব। চেহারা-ছবি সুন্দর। কিছুক্ষণ কথা বলার পরেই ছেলেটাকে ঘরের ছেলে বলে মনে হতে লাগল। মোবারক এক পর্যায়ে বললেন, চল আমার সঙ্গে। এক লগে ব্যবসাপাতি করবা। নৌকা লইয়া দেশ-বৈদেশ ঘুরি, সাথে আপনার লোক থাকলে ভাল লাগে। যাইবা? সুরুজ সঙ্গে সঙ্গে বলল, জ্বি আইচ্ছা।

'নৌকা বাইতে পার?'

'জ্বে না।'

'নৌকা বাওন এমন কোন শক্ত কাম না।'

'শক্ত কামরে আমি ডরাই না মোবারক ভাই।'

মোবারক খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে সুরুজের দিকে তাকিয়ে বলল, শোন, তুমি বয়সে মেলা ছোট। আমারে ভাই ডাকব না। চাচা ডাকবা। কোন অসুবিধা আছে?

'জ্বে না।'

সম্পর্ক পাল্টানোর পেছনে মোবারকের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কাজ করেছে। ছেলেটাকে তাঁর ভালই মনে ধরেছে। কুসুমের সঙ্গে বিয়ে দেয়া যেতে পারে। ছেলের

চেহারা-ছবি ভাল, আদব-কায়দা ভাল। সমস্যা একটাই — অনাথ ছেলে। অনাথ ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করতে নেই। অনাথ ছেলে মানে ভাগ্যহীন ছেলে। ভাগ্যহীনের সাথে সম্পর্ক করলে মেয়ের ভাগ্যও নষ্ট হবে। মেয়েও কষ্ট করবে সারাজীবন। এইসব মুরুব্বীদের কথা। মুরুব্বীরা তো না জেনে-শুনে কথা বলেন না।

মনোয়ারার আনন্দের কোন সীমা নেই। শাহানাকে দিয়ে তিনি যখন প্রার্থনা করিয়েছেন তখনি বুঝে গেছেন কাজ হবে। এক একজন মানুষ আল্লাহর রহমত নিয়ে পৃথিবীতে আসে। এই মেয়েটিও এসেছে। তার কথা আল্লাহ অগ্রাহ্য করেননি। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে জোগাড় করে দিয়েছেন। অনাথ ছেলে, ঘর-বাড়ি নেই, টাকা-পয়সা নেই — তাতে কি? আল্লাহপাকের এনে দেয়া ছেলে, তিনিই রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। শুকরানা আদায়ের জন্যে তিনি জুম্মাঘরে শুক্রবারে সিন্নি মানত করলেন। ছেলেটাকে তিনি যত দেখছেন তত তাঁর ভাল লাগছে। কি সুন্দর করে চাচী ডাকে! কি নরম করে কথা বলে, চোখ তুলে তাকায় না। দেখেই বোঝা যায়, এই ছেলে কোনদিন মায়ের আদর পায়নি। আদর-যত্নের সঙ্গে সে পরিচিত নয়। আদর পেলেই চেহারা কেমন হয়ে যায়। দুপুরে ভাত বেড়ে দিয়ে তিনি ইচ্ছা করেই কুসুমকে বললেন — ও কুসুম, গরম আইজ বেজায় পড়ছে, পাংখা দিয়া বাতাস কর।

কুসুম হাসিমুখে বলল, পাংখা দিয়া মাথার মইধ্যে একটা বাড়ি দিয়া দেই মা?

'ক্যান, বাড়ি দিবি ক্যান?'

'ইচ্ছা করতাছে।'

মনোয়ারা আতংকিত গলায় বললেন, থাউক বাতাস লাগব না। মেয়ের মতিগতি ঠিক নেই। পাখা দিয়ে বাড়ি দিয়েও বসতে পারে। জ্বীনের আছর যে মেয়ের উপর আছে এতে অস্বীকার করার কিছু নেই। সাধারণত পুরুষ জ্বীনগুলি কুমারী মেয়েদেরই বিরক্ত করে। বিয়ের পর আর করে না। আল্লাহ আল্লাহ করে বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে জ্বীনের উপদ্রব থেকেও বাঁচা যায়।

'ছেলেটারে তোর কেমন লাগে রে কুসুম?'

'ভাল।'

'অনাথ ছেলে তো — এরার মায়া-মুহব্বত থাকে বেশি।'

'মায়া-মুহব্বত বেশি থাকনই ভাল।'

মনোয়ারা প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন — দেখি যদি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয় ...

তিনি কথা শেষ করলেন না। ব্যাপারটা এখনই বলা ঠিক হবে না। মেয়ের মেজাজের ঠিক নেই। ফট করে উল্টে যেতে পারে। কি দরকার ঝামেলা বাড়ানোর। ভালয় ভালয় মেয়ে পার করতে পারলে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজার শুকরিয়া।

কুসুম বলল, কথা তো মা শেষ করলা না।

'তোর বাপজানের ইচ্ছা তোর সাথে বিবাহ দেয়।'

'ও আইচ্ছা।'

'আমরার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছুই হইব না। সবই আল্লাহপাকের উপরে। কার সাথে কার বিবাহ হইব এইটা আল্লার ঘরে সোনার কলম দিয়া লেখা থাকে। মানুষের করনের কিছু নাই — তবু একটা চেষ্টা।'

কুসুম হাসছে। মনোয়ারার মনে হল সে খুশি হয়েই হাসছে। হাসলে এত সুন্দর লাগে তার মেয়েটাকে!

'বিয়া কবে হইতাছে মা?'

'শ্রাবণ মাস বিয়ার জন্য ভাল — দেখি কি হয়। এক কথায় তো আর বিয়া হয় না। জোগাড়যন্ত্র আছে।'

'জোগাড়যন্ত্রের কি আছে, মৌলবী ডাইক্যা আন — কবুল কবুল কবুল। বিয়া শেষ।'

মনোয়ারা শংকিত চোখে মেয়েকে দেখছেন। মেয়ের কথাবার্তা সাধারণ মানুষের মত মনে হচ্ছে না, কথাবার্তা-হাবভাবে জ্বীনের ইশারা আছে। বিয়ে যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

মা'র পীড়াপীড়িতেই কুসুমকে তেল দিয়ে চুল বাঁধতে হল। দুই বেনীতে কুসুমকে ভাল লাগে। দুই বেনী করা হয়েছে। এক রঙের দু'টা ফিতা থাকলে সুন্দর হত। দুই রঙের দু'টা ফিতা। একটা লাল একটা সবুজ। তাতেও কুসুমকে সুন্দর লাগছে। চোখে কাজল দিয়েছে গাঢ় করে। কুসুমের সুন্দর চোখ আরো সুন্দর লাগছে। বাপের এবারে আনা এক রঙের সবুজ শাড়ি খুব ফুটেছে। কুসুম যেন ঝলমল করছে।

মোবারক ফিরেছেন শুনে মতি এসেছে দেখা করতে। ঘরের উঠানে কুসুমের সঙ্গে দেখা। মতি হকচকিয়ে গেল। ঝাটা হাতে উঠান ঝাট দিচ্ছে ফুটফুটে এক পরী। মতি কিছু বলার আগেই কুসুম বলল, আমরার গাতক ভাইয়ের শইল ভাল?

'হ্যাঁ শইল ভাল। এমন সাজ কেন কুসুম?'

কুসুম হাসিমুখে বলল, বিয়ার কন্যা, না সাজলে চলব?

'বিয়ার কন্যা?'

কুসুমের হাসি আরো বিস্তৃত হল। মাথার বেনী দুলিয়ে বলল, আফনে ভাবছিলেন কি জন্মে আমার বিবাহ হইব না? আমি কানাও না, লেংড়াও না। আমার চেহারা ছবি ভাল। এই দেহেন কত লম্বা চুল। আমার বিয়া হইব না ক্যান?

'কি কও তুমি, বিয়া তো হইবই। বিয়া না হওনের কি আছে?'

'সবের তো হয় না। আল্লার ঘরে সোনার কলম দিয়া লেখা না থাকলে বিয়া হয় না।'

'পাত্র কে?'

'পাত্রের নাম ক্যামনে কই, পাপ হইব না? দিনে দুপুরে আসমানে যে জিনিশ থাকে সেই জিনিশের নামে তার নাম।'

'সুরুজ?'

'এই তো পারছেন। লোকে আফনেরে বোকা কয় এইটা ঠিক না। আফনের বুদ্ধি আছে। অল্পবিস্তর হইলেও আছে।'

কুসুম গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করল, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এই খবরে মতি মোটেই বিচলিত হচ্ছে না। বরং তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুশি হয়েছে। বেশ খুশি।

মতি আগ্রহের সঙ্গে বলল, বিয়ার তারিখ হইছে?

'না হয় নাই, তয় শ্রাবণ মাসেই হইব। শ্রাবণ মাস বিয়াশাদীর জন্য ভাল।'

'তোমার বিয়ার দিন বড় কইরা একটা গানের আসর করব কুসুম।'

'কইরেন।'

'ধুম বাদ্য-বাজনা হইব।'

'আমার শুননের উপায় নাই। আমি হইলাম বিয়ার কইন্যা।'

'মোবারক চাচা কই?'

'জানি না কই। পাড়া ঘুরতে গেছে।'

'উনারে বলবা খুঁজ নিতে আসছিলাম।'

'বলব, অবশ্যই বলব।'

'তোমার বিবাহ, এইটা শুইন্যা মনে বড় আনন্দ হইতাছে কুসুম। বড় আনন্দ।'

'আমারো আনন্দ হইতাছে। বাপ-মা'র গলার মধ্যে কই মাছের কাঁটা হইয়া বিন্দা ছিলাম। কাঁটা হওনের দুঃখু আছে। আছে না?'

'অবশ্যই আছে। অবশ্যই আছে। তোমারে আইজ বড়ই সৌন্দর্য লাগতাছে কুসুম। বড়ই সৌন্দর্য।'

'সৌন্দর্য মাইনষের চউক্ষে। যার চউখ সুন্দর তার সব সুন্দর । আফনের চউখ সুন্দর।'

মতি কুসুমের বাড়ি থেকে বিষণ্ণ মুখে ফিরল। কুসুমের বিয়ে শ্রাবণ মাসে ঠিক হয়ে গেলে সমস্যা আছে। হাত একেবারে খালি। গানের আসর করার কথা দিয়ে ফেলেছে। আসরটা সে করবে কি ভাবে?

রাত ন'টা। ইরতাজুদ্দিন খেতে বসেছেন। তাঁর সামনে শাহানা বসেছে। সহজ ভঙ্গিতেই বসেছে। সে তার দাদাজানের দিকে প্লেট এগিয়ে দিল। ইরতাজুদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, নীতু খাবে না?

শাহানা বলল, না।

সে কাল রাতে খায়নি। আজ সারাদিনেও না। শাহানাকে তা নিয়ে মোটেও বিচলিত মনে হচ্ছে না। ইরতাজুদ্দিনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। মেয়ে দু'টি আশ্চর্য স্বভাবের।

ইরতাজুদ্দিন বললেন, তুই ওকে সাধাসাধি করিসনি?

'করলে লাভ হবে না। কঠিন মেয়ে।'

'না খেয়ে ক'দিন থাকবে?'

'আরো তিনদিন।'

'এতো মারা পড়বে।'

শাহানা শান্ত গলায় বলল, না, মারা পড়বে না। পানি খাচ্ছে, চা খাচ্ছে। চায়ে চিনি আছে — শর্করা। ক্যালোরি খানিকটা চিনি থেকে পাবে।

'তোর কাছ থেকে ডাক্তারিবিদ্যা শুনতে চাচ্ছি?'

'কি শুনতে চাচ্ছেন তা তো জানি না দাদাজান।'

'কিছুই শুনতে চাচ্ছি না। আমি ওর মুখ হা করে ধরব — তুই দুধ ঢেলে দিবি।'

শাহানা সহজ গলায় বলল, সেটা ঠিক হবে না দাদাজান। শ্বাসনালীতে দুধ চলে যেতে পারে। ফোর্স ফিডিং যদি করাতেই হয় টিউব দিয়ে করাতে হবে।

'তোর কি মোটেই দুঃশ্চিন্তা লাগছে না?'

'দুঃশ্চিন্তা করার এখনো কিছু হয়নি।'

'বাড়িতেও কি সে এ রকম করে?'

'না, হাঙ্গার স্ট্রাইক এই প্রথম করল।'

ইরতাজুদ্দিন কঠিন গলায় বললেন, তোদের তেজ খুব বেশি হয়ে গেছে। এত তেজ হবার কারণটা কি?

'কারণটা জেনেটিক। বংশসূত্রে পাওয়া।'

ইরতাজুদ্দিন খেতে বসেও খেতে পারছেন না। তিনি দুপুরে খাননি। প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও তিনি প্লেট সরিয়ে উঠে পড়লেন। অথচ শাহানা শান্ত ভঙ্গিতে খেয়ে যাচ্ছে। যেন কিছুই হয়নি।

ইরাতাজুদ্দিন পুষ্পকে আনতে লোক পাঠিয়ে ঢুকলেন নীতুর ঘরে। নীতু শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, সে উঠে বসল। দাদাজানের দিকে তাকিয়ে হাসল। ইরতাজুদ্দিন বসলেন তার পাশে।

'কি বই পড়ছিস?'

'ভূতের বই দাদাজান। নিশিরাতের আতংক।'

'খুব ভয়ের?'

'খুব ভয়ের না, মোটামুটি ভয়ের?'

ইরতাজুদ্দিন ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, পুষ্পকে আনতে লোক পাঠিয়েছি।

'থ্যাংক য়্যু দাদাজান।'

'ও এলে কি করতে হবে — তোর সামনে ক্ষমা চাইতে হবে?'

'আমার সামনে না চাইলেও হবে।'

ইরতাজুদ্দিন পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। তিনি সিগারেট খান না বললেই হয়। হঠাৎ হঠাৎ সিগারেট ধরান।

'নীতু!'

'জ্বি।'

'পুষ্প মেয়েটা রাতে কোথায় ঘুমায়? তোর সাথে, না নিচে তার নিজের মাদুরের বিছানায়?'

'ও নিচে ঘুমায়।'

ইরতাজুদ্দিন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন — মেয়েটা তোর হাত ধরে হাঁটছিল বলে আমি রাগ করেছিলাম। তোর কাছে মনে হল কাজটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে। মানুষে মানুষে আমি প্রভেদ করে ফেলেছি। সেই প্রভেদটা তো তোর মধ্যেও আছে। তুই তো মেয়েটাকে পাশে নিয়ে ঘুমুচ্ছিস না? ওকে ঘুমুতে হচ্ছে মেঝেতে।

নীতু তাকিয়ে আছে। কিছু বলছে না।

ইরতাজুদ্দিন বললেন — যে ত্রুটি নিজের মধ্যে আছে সেই ত্রুটির জন্যে অন্যের উপর কি রাগ করা যায়?

নীতু বলল, না।

'আমরা মুখে বলি — সব মানুষ সমান। মনে কিন্তু বিশ্বাস করি না। শুধুমাত্র মহাপুরুষরাই এই কাজটা পারেন। মনে যা বিশ্বাস করেন মুখে তাই বলেন। মহাপুরুষ

চেষ্টা করে হওয়া যায় না। মহাপুরুষের বীজ ভেতরে থাকতে হয়। তোর ভেতর এই জিনিশটা নেই।'

নীতু চুপ করে রইল। ইরতাজুদ্দিন বললেন — তোর ভেতর না থাকলেও শাহানার ভেতর এটা আছে।

'কি করে বুঝলেন আপার আছে?'

'বোঝা যায়।'

নীতু নিচু গলায় বলল — দাদাজান, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আপার মধ্যে এটা আছে। আমাদের বাসায় কাজের মেয়েদের যখন অসুখ হয় তখন ভাত মেখে আপা তাদের মুখে তুলে খাওয়ায়। দেখেই আমার যেন কেমন কেমন লাগে। আমি এই কাজটা কখনো করতে পারব না।

ইরতাজুদ্দিন বললেন, আয়, খেতে আয়। নীতু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ইরতাজুদ্দিন বললেন, আমি যদি ভাত মেখে তোর মুখে তুলে দেই তাহলে কি তোর কেমন কেমন লাগবে?

নীতু বলল, লাগবে।

খাবার টেবিলে ইরতাজুদ্দিন নীতুকে নিয়ে বসেছেন। নতুন করে মাছ ভাজা হচ্ছে। গরম গরম ভেজে পাতে তুলে দেবে। নীতু প্লেটে ভাত নিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে। ইরতাজুদ্দিন বললেন, কাল ভোরে মজার একটা ব্যাপার হবে। ভাবছিলাম তোদের বলব না, অবাক করে দেব। বলেই ফেলি — মিতু আসবে। সম্ভবত মোহসিনও আসবে।

'বলেন কি?'

'শাহানাকে কিছু বলার দরকার নেই। ওকে চমকে দেব।'

'আপাকে চমকে দেবার জন্যেই কি এটা করেছেন?'

'না। আমি কাজটা করেছি নিজের স্বার্থে। ওরা এলে তোরা হয়ত আরো কয়েকদিন বেশি থাকবি। বাড়িটা গমগম করবে। মানুষ খুব স্বার্থপর প্রাণী, তারা নিজের স্বার্থটা দেখে।'

প্রকাণ্ড এক টুকরা ভাজা মাছ চলে এসেছে। ভাজা মাছের গন্ধে বাড়ি ম-ম করছে। নীতুর জিবে পানি চলে এসেছে। এরকম তার আগে কখনো হয়নি। ইরতাজুদ্দিন হাসিমুখে নীতুর খাওয়া দেখছেন।

নীতুর অনেকদিন পর আজ প্রথম মনে হল — তার দাদাজান মানুষটাকে যতটা খারাপ ভাবা গেছে তত খারাপ না।

'দাদাজান!'

'হুঁ।'

'আপনি কি কোন ভয়ংকর ভূতের গল্প জানেন?'
'জানি। শুনবি?'
'হ্যাঁ শুনব।'
'খাওয়া শেষ করে আয় আমার ঘরে।'
'পুষ্প যদি আসে তাকে কি সঙ্গে করে নিয়ে আসব?'
'নিয়ে আসিস।'

পুষ্প এল না। আসবে কি করে? তার বাড়িতে আনন্দের সীমা নেই। বাপজান এসেছে এতদিন পর। বাপের সঙ্গে এসেছে সুরুজ ভাই। ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে, সুরুজ ভাইয়ের সঙ্গে কুসুম বু'র বিয়ে হবে। বাপজান আর মা'র মধ্যে ফিসফাস কথা হচ্ছেই। নিন্দালিশের বড় খালা এসেছেন। ফিসফাসের সঙ্গে তিনিও যুক্ত হয়েছেন। কুসুম বু' সেজেগুজে ঘুরঘুর করছে। রোজ রাতে নারকেল তেল দিয়ে তার চুল বেঁধে দেয়া হচ্ছে। নিন্দালিশের বড় খালা নীলরঙা একটা শাড়ি এনেছেন। সেই শাড়ি পরার পর কুসুমবু'কে আর পৃথিবীর মেয়ে বলে মনে হয় না। মনে হয় সে আকাশের মেয়ে — এক্ষুণি উড়ে আকাশে গিয়ে মিশে যাবে। এত মজা ছেড়ে রাজবাড়িতে আসার তার ইচ্ছে হচ্ছে না। ইরতাজুদ্দিন সাহেবের সামনে পড়তেও তার ভয় লাগছে। রাজবাড়ি থেকে দূরে থাকাই ভাল।

নীতুর দাদাজানের খাটটা ফুটবল খেলার মাঠের মত বিশাল। নীতু সেই বিশাল খাটের মাঝামাঝি বসে আছে। তার সামনে বালিশে হেলান দিয়ে ইরতাজুদ্দিন ভূতের গল্প শুরু করলেন —

"আমি তখন যুবক মানুষ। এলএলবি পাশ করেছি। ময়মনসিংহ কোর্টে এসেছি — হাবভাব বুঝব। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়ার কথা হচ্ছে। আমার বাবাময়েজউদ্দিন চৌধুরী যেদিন বলবেন বিলেত যা, সেদিনই যাব। তাঁর কথার উপর কথা বলার সাহস কারোর নেই। তিনি বলেছেন, কিছুদিন কোর্টে ঘোরাফিরা কর; তাই করছি। ময়মনসিংহে বিরাট একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। একা থাকি। মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ কোর্টের পেশকার ফখরুল আমিন সাহেবের বাড়িতে যাই দাবা খেলার জন্যে। আমার তখন দাবা খেলার খুব নেশা।

নীতু বলল, দাদাজান, এটা কি ভূতের গল্প?

'না, ঠিক ভূতের গল্প না। এটা শুনে নে, তারপর ভূতের গল্প বলব। একদিন আমিন সাহেবের বাড়িতে দাবা খেলতে গেছি — গিয়ে শুনি উনি কি কাজে বিক্রমপুর গেছেন। তাঁর বড় মেয়ে পর্দার আড়াল থেকে বলল, আপনি বসুন, চা খেয়ে যান।

আমি বসলাম। মেয়েটা চা এনে দিল। নিজেই এনে দিল।'

'উনিই কি আমার দাদীজান?'

ইরতাজুদ্দিন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ।

'তারপর?'

'মেয়েটাকে বিয়ে করলাম। বাবা খুব বিরক্ত হলেন। সামান্য পেশকারের মেয়েকে তাঁর ছেলে বিয়ে করবে এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে উঠলাম। বাবা মূল বাড়ির থেকে দূরে — এখানে যে কাঠালগাছটা আছে সেখানে ঘর বানিয়ে দিলেন। জোহরার থাকার জায়গা হল ঐ ঘরে।

'উনার নাম জোহরা?'

'হুঁ।'

'আপনিও ঐ ঘরে থাকতেন?'

'না। বাবা আমাকে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। ও একাই থাকত। বিলেত থাকার সময়ই খবর পাই ছেলে হতে গিয়ে ও মারা গেছে। ডাক্তার ছিল না, ওষুধপত্র ছিল না। অনাদর অবহেলায় তোর বাবার জন্ম হয়। তোর বাবা কি কখনো এইসব নিয়ে তোদের সঙ্গে গল্প করেছে?'

'না, তবে বাবা বলেছেন তিনি মানুষ হয়েছেন তাঁর বড় মামা-মামীর কাছে।'

'এই বাড়িটা ছিল তোর বাবার কাছে এক দুঃস্বপ্নের বাড়ি। এখনো তাই আছে। সে কখনো আসে না — তার মেয়েদেরও আসতে দেয় না। এই বাড়িটা তার কাছে বন্দিশিবির।'

'আসলেই তো বন্দিশিবির।'

'বুঝলি রে নীতু, এই বন্দিশিবিরে আমি সারা জীবন একা একা কাটিয়েছি। আমি কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়ে করিনি। ইচ্ছা করলেই বিয়ে করতে পারতাম। ইচ্ছে হয়নি। এই ব্যাপারটা তোর বাবার চোখে পড়ল না। তোর বাবার শুধু চোখে পড়ল — আমার কারণে তার মা বন্দি হলেন রাজবাড়িতে। আমার কারণে তাঁর মৃত্যু হল।

'আমার দাদীজান কি সত্যি সত্যি এই রাজবাড়িতে বন্দি হয়ে ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমার বাবা তাকে ঐ ঘর থেকে বের হতে দিতেন না। জোহরার মা-বাবা-ভাই-বোন কারো সঙ্গে তাকে দেখা করতেও দেননি। বিলেত থাকার সময় আমি যেসব চিঠিপত্র তাকে লিখেছি সেসবও তাকে দেয়া হয়নি। তার কোন চিঠিও আমার কাছে পাঠানো হয়নি।'

'উনি কি খুব সুন্দরী ছিলেন দাদাজান?'

'হ্যাঁ।'

'উনার কোন ছবি আছে?'

'একটা আছে। দেখবি?'

'হ্যাঁ দেখব।'

ইরতাজুদ্দিন খাট থেকে নামলেন। চাবি দিয়ে আলমারি খুলে ছবি বের করে নীতুর হাতে দিলেন। কালো মেহগনি কাঠের ফ্রেমে বাঁধা ছবি। নীতু ছবি হাতে নিয়ে হতভম্ব গলায় বলল, এ তো অবিকল আপার ছবি!

ইরতাজুদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ, শাহানার সঙ্গে ওর সাংঘাতিক মিল।

'ছবিটা আপনি সরিয়ে রাখেননি কেন দাদাজান? লুকিয়ে রেখেছেন কেন?'

ইরতাজুদ্দিন জবাব দিলেন না। নীতু বলল, দাদীজানের কথা আরো বলুন, আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে। উনি কি খুব হাসিখুশি মহিলা ছিলেন?

'না। চুপচাপ থাকত। তবে ভয়ঙ্কর জেদ ছিল। যা বলবে তাই।'

'আমার মত?'

'হুঁ। খানিকটা তোর মত। যা নীতু, ঘুমুতে যা — রাত অনেক হয়েছে।'

নীতু বলল, আজ আমি আপনার সঙ্গে ঘুমুব দাদাজান। যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।

ইরতাজুদ্দিনের পাশে নীতু শুয়ে আছে। এক সময় তার মনে হল তার দাদাজান কাঁদছেন। নীতু ভয়ে ভয়ে একটা হাত তার দাদাজানের গায়ের উপর রাখল। ইরতাজুদ্দিন কাঁদছেন। তাঁর শরীর কাঁপছে, সেই সঙ্গে কাঁপছে নীতুর ছোট্ট হাত।

যে হাত একজন নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতি মমতায় আর্দ্র।

১৯

সুরুজ আলি অনেক রাতে খেতে বসেছে। অন্দরবাড়িতেই তাকে খেতে দেয়া হয়। আজ বাংলাঘরে খাচ্ছে। পুষ্প ভাত-তরকারি এগিয়ে দিচ্ছে। দরজার বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কুসুম।

মনোয়ারার ব্যথা ওঠেছে। ব্যথায় কাটা মুরগির মত ছটফট করছেন। মনোয়ারার বড় বোন আনোয়ারা বোনের পাশে আছেন। আজ তাঁর চলে যাবার কথা ছিল। মনোয়ারার ব্যথা ওঠার কারণে যেতে পারছেন না। আনোয়ারা এসেছিলেন কুসুমের বিয়ের ব্যাপারটা ফয়সালা করতে। তিনি মোটামুটিভাবে করেছেন। ছেলে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি কুসুমকে বলেছেন — অনাথ ছেলে হলেও সে যে উঁচু বংশের তা বোঝা যায়। কারণ ভাত খাওয়ার সময় এই ছেলে ছোট ছোট ভাতের নলা করে মুখে দেয়। ভাতের নলা যার যত ছোট তার বংশ তত উঁচু।

কুসুম তার উত্তরে বলেছে, তাহলে তো খালাজান মুরগির বংশ সবচাইতে উঁচা। মুরগি একটা একটা কইরা ভাত খায়।

কুসুমের কথায় তিনি খুবই বিরক্ত হয়েছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, কুসুম বোধহয় এই বিয়েটা চাচ্ছে না। তিনি কুসুমকে আড়ালে ডেকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিন্ত হলেন যে, কুসুমের কোন আপত্তি নেই। ছেলে কুসুমেরও পছন্দ।

তিনি কুসুমকে আশ্বস্ত করে বলেছেন — ছেলে কাজকাম করে না এইটা নিয়া তুই চিন্তা করিস না। রুটি-রুজির মালিক মানুষ না, আল্লাহপাক। আর পুরুষ মাইনষের ভাগ্য থাকে ইস্তিরির শাড়ির অঞ্চলে বান্দা।

'আমার শাড়ির অঞ্চলে তো খালাজান কিছুই নাই।'

'আছে কি নাই এইটা তোর জানার কথা না। জানেন আল্লাহপাক। আর আমরা তো আছি। বানে ভাইস্যা যাই নাই।'

কুসুমের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তার খালাজানই অবস্থাসম্পন্ন। কুসুমের বিয়ের খরচপাতির বেশিরভাগই তিনি করবেন। কাজেই তাঁর কথাবার্তা গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হয়।

আড়াল থেকে কুসুম মানুষটার খাওয়া দেখছে। ভিতরবাড়িতে সে সামনে যায়

কিন্তু বাংলাঘরে পরপুরুষের সামনে যাওয়া যায় না। কুসুম মনে মনে হাসছে। খালা এই মানুষটাকে যত বড় ঘরের মনে করছেন সে তত বড় ঘরের না। এই তো বিরাট বিরাট নলা করে মুখে দিচ্ছে। খিদে মনে হয় খুব লেগেছে। খাওয়া দিতে অনেক দেরি হল।

এক সময় কুসুম বলল, আফনের পেট ভরছে? লোকটা ধড়মড় করে উঠল। কুসুম যে এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়েছিল সে বুঝতে পারেনি।

'অযত্ন হইলে ক্ষমা দিবেন। মা'র শইলডা ভালা না।'

'অযত্ন হয় নাই।'

'পুষ্প, যা পান বানাইয়া আন।'

পুষ্প পান আনতে গেল। কুসুম ঘরে ঢুকল।

গ্রামের একেবারে এক প্রান্তে বাড়ি, তার উপর বলতে গেলে নিশুঁতি রাত। সে কি করছে না করছে দেখার কেউ নেই। কুসুমকে ঢুকতে দেখে সুরুজ আরও হকচকিয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল। কুসুম বলল, বসেন বসেন। সুযোগ বুইজ্যা দুইটা কথা বলতে আসছি।

সুরুজ বলল, কি কথা?

কুসুম সঙ্গে সঙ্গে বলল, ব্যাঙের মাথা।

সুরুজ তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। কুসুম বলল, আমার কথায় অবাক হইয়েন না। আমি জ্বীনে ধরা মেয়ে। আমার কথাবার্তা কাজকর্মের ঠিকঠিকানা নাই।

সুরুজ বিস্মিত হয়ে বলল, জ্বীনে ধরা?

'হুঁ। অনেক তাবিজ-টাবিজ দিছে। তাবিজে কাজ হয় না। আফনে চিন্তা কইরেন না। বিয়ার পরে জ্বীন থাকে না।'

কুসুম চৌকির উপর বসল। সহজ ভঙ্গিতেই বসল। যেন অনেক দিনের চেনা মানুষের সঙ্গেই গল্প করতে বসেছে। পুষ্প পান নিয়ে এসে সরু চোখে কুসুমের দিকে তাকাল। কুসুম বলল, থালাবাটি লইয়া ভিতরে যা কুসুম, আমি আসতাছি।

পুষ্প থালাবাটি নিয়ে চলে গেল। কুসুম সুরুজের দিকে পানদান এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আফনেরে সবের খুব পছন্দ হইছে। আমারও হইছে।

সুরুজ খুক খুক করে কাশল।

কুসুম বলল, জ্বীনের কথা শুইন্যা ভয় পাইছেন না। পুরুষ মানুষের ভয় ভাল জিনিশ না। আর জ্বীন তো আমারে রোজদিন ধরে না, মাঝে মইধ্যে ধরে।

সুরুজ ক্ষীণ স্বরে বলল, তখন কি হয়?

'এইসব আফনের শুইন্যা লাভ নাই। আমার যে বিয়া হয় না, এই কারণেই হয় না। কত সম্বন্ধ আইল, কত সম্বন্ধ ভাঙল। নেন, পান খান।'

কুসুম নিজেই পান এগিয়ে দিল। সুরুজ পান নিল ভয়ে ভয়ে। কুসুম বলল, এক রাইতে কি হইছে শুনেন — জ্বীনের আছর হইছে — নিশুঁত রাইত, আমি দরজা খুইল্যা বাইর হইছি। উপস্থিত হইছি মতি ভাইয়ের বাড়িতে। ছিঃ ছিঃ, কি কেলেঙ্কারি! মতি ভাই থাকে একলা। জোয়ান পুরুষ, সে দরজা খুইল্যা আমারে দেইখ্যা অবাক। আমার কথা শুইন্যা মনে কিছু নিয়েন না। আফনেরে আপন ভাইব্যা বলতেছি।

সুরুজ আবার কাশল। তার মুখ ভর্তি পান। কিন্তু সে পান চিবুতে পারছে না। কুসুম ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, আফনে ঘুমান। রাইত মেলা হইছে।

কুসুম ঘর থেকে বের হয়ে দেখল, অন্ধকারে দরজার ওপাশে পুষ্প দাঁড়িয়ে আছে। সে থালাবাটি নিয়ে চলে যায়নি, নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। পুষ্প নরম গলায় বলল, বুবু, তুমি নিজেই বিয়া ভাইঙ্গা দিলা!

কুসুম বলল, হুঁ। কাউরে কিছু বলিস না পুষ্প।

'আমি কাউরে কিছু বলব না, কিন্তুক সুরুজ ভাই বলব। বাপজানরে বলব।'

'না, সেও কিছু বলব না। কাউরে কিছু না বইলা পালাইয়া যাইব।'

'উহুঁ।'

কুসুম তীক্ষ্ন গলায় বলল, উহুঁ বলছস ক্যান?

'সুরুজ ভাই পালাইব না। তোমারে তার খুব মনে ধরছে। জ্বীন-ভূতের কথা বইল্যা তারে খেদাইতে পারবা না।'

ব্যথায় মনোয়ারা সারারাত কষ্ট পেলেন। মোবারক ফিরলেন মাঝরাতে — খালি হাতে। রাজবাড়ির মেয়ের লেখা ওষুধ নিন্দালিশ বাজারের ফার্মেসিতে পাওয়া গেল না।

ভোরবেলা ব্যথা কমে গেল। মনোয়ারা সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখলেন — কুসুমের বিয়ে হচ্ছে। চারদিকে বাদ্যবাজনা বাজছে। রাজবাড়ির মেয়েটা এসে কুসুমকে সাজিয়ে দিচ্ছে। সে কালো একটা বাক্সভর্তি গয়না নিয়ে এসেছে। বাক্স থেকে গয়না নিয়ে একের পর এক পরিয়ে দিচ্ছে। পাথর বসানো কি সুন্দর ঝলমলে গয়না!

নীতু বলল, সুখানপুকুর নামের মানে কি আপা?

শাহানা বলল, যে পুকুর শুকিয়ে গেছে সেই পুকুরই সুখানপুকুর।

'তাহলে তো বানান হওয়া উচিত তালিব্য শ দিয়ে . . .'

শাহানা বিরক্ত গলায় বলল, তোকে নিয়ে বের হবার প্রধান সমস্যা হল — তুই খুব তুচ্ছ জিনিশ নিয়ে জটিল তর্কে যেতে চাস।

নীতু বলল, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বের হবার প্রধান সমস্যা কি তুমি জান?

'না।'

প্রধান সমস্যা হল — সব সময় তোমার মুডের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। তোমার দিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হয়। মোহসিন ভাই তোমাকে বিয়ে করে কি ভয়ংকর বিপদে যে পড়বে তা সে জানে না।

'জানিয়ে দিস।'

'আসলেই জানানো উচিত। উনি এলেই প্রথম এই কথা বলব।'

শাহানা বিস্মিত হয়ে বলল, উনি এলেই মানে? সে আসছে না-কি?

'হুঁ।'

'হুঁ মানে কি? পরিষ্কার করে বল।'

'উনি আসছেন, মিতু আপা আসছে।'

'কেন?'

'দাদাজান তাদের আনার জন্যে লোক পাঠিয়েছেন।'

'কখন আসবে?'

'আজ ভোরবেলা এসে পৌঁছানোর কথা। এই জন্যেই আমি তোমার সঙ্গে বের হতে চাইনি। তুমি জোর করে নিয়ে এলে।'

'দাদাজান হঠাৎ ওদের নিয়ে আসছেন কি জন্যে?'

'সেটা দাদাজানই জানেন। সম্ভবত তোমাকে অবাক করে দিতে চান।'

'আমাকে অবাক করবার তাঁর দরকারটা কি?'

'তোমাকে উনি খুবই পছন্দ করেন। আমরা যাদের পছন্দ করি তাদের অবাক করে দিতে আমাদের ভাল লাগে।'

শাহানা বিরক্ত বোধ করছে। মিতু আসছে আসুক। মিতুর সঙ্গে মোহসিন আসছে কেন? বিয়ের আগের সময়টা সে নিজের মত করে থাকতে চায়? নীতু বলল, তুমি

মুখটা এমন কাল করে ফেললে কেন? মোহসিন ভাই আসছে এতে তো তোমার আনন্দিত হবার কথা। এখন আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমাকে ঘুরতে হবে না। তুমি সঙ্গী পেয়ে গেলে।

'এত কথা বলিস না তো নীতু, মাথা ধরে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা আর কথা বলব না। এখন থেকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সাইন ল্যাংগুয়েজে জবাব দেব। আপা, তুমি কি সাইন ল্যাংগুয়েজ জান? "আমি তোমাকে ভালবাসি" এটা সাইন ল্যাংগুয়েজে কি ভাবে বলা হয়?'

'তুই চলে যা নীতু। আমি একা একা ঘুরব।'

'চলে যাব?'

'হ্যাঁ চলে যা। ওরা আসবে, ওদের জন্যে অপেক্ষা কর।'

'তুমি বাড়িতে ফিরবে কখন?'

'দুপুরের আগেই ফিরব।'

'ওরা যদি চলে আসে তোমাকে খবর পাঠাব?'

'না।'

নীতু খুশি মনে চলে যাচ্ছে। শাহানা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা খুব সুন্দর। ছোট্ট সুন্দর একটা দীঘি। গ্রামের দীঘির চারদিকে সাধারণত নারকেল গাছ কিংবা তালগাছ থাকে। এই দীঘিটার চারদিকে কদমগাছ। কদমফুল ফুটে আলো হয়ে আছে। অপরিকল্পিতভাবে এমন কিছু করা যায় না। খুব রুচিবান কোন মানুষ ভেবেচিন্তে গাছগুলি লাগিয়েছেন। কে সেই রুচিবান মানুষ?

শাহানা মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে কদমগাছ দেখছে। এই মুহূর্তে কেউ যদি তাকে বলে পৃথিবীর সবচে' সুন্দর ফুলের নাম কি? সে অবশ্যই বলবে — কদম।

'আম্মাজি!'

শাহানা চমকে তাকাল। বৃদ্ধ একজন মানুষ কখন যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিনয়ে প্রায় নুয়ে পড়েছে। মুখে আনন্দের হাসি।

'কি দেখেন আম্মাজি?'

'কদমগাছ দেখি। দীঘির চারদিকে এমন সুন্দর করে কে কদমগাছ লাগিয়েছে বলতে পারেন?'

'কেউ লাগায় নাই আম্মাজি, আপনাআপনি হইছে।'

'সত্যি?'

'জ্বি।'

'এই গ্রামে কি আরো দীঘি আছে?'

'জ্বি-না। একটাই দীঘি?'

'দীঘিটার নাম কি?'

'কোন নাম নাই আম্মাজি — আফনে একটা নাম দেন, আমরা হেই নামে ডাকব।'

'আমি একটা নাম দিলেই সবাই এই নামে ডাকবে?'

'অবশ্যই ডাকব। এই গেরামের মানুষ যে আফনেরে কত ভাল পায় এইটা আফনে জানেন না।'

শাহানা লজ্জিত গলায় বলল, আমি তো আপনাদের জন্য তেমন কিছু করিনি। দশ-বার জন রোগি দেখেছি। সেটা তো আমি দেখবই। আমি তো আপনাদের গ্রামেরই মেয়ে। ডাক্তার হয়েছি। রোগি দেখা তো আমার পেশা।

'আফনের রোগি দেখা আর অন্যের রোগি দেখার মইধ্যে আসমান-জমিন ফারাক আছে।'

শাহানা হাসছে। সে এখনো তাকিয়ে আছে কদমগাছগুলির দিকে — ইস্‌, কি সুন্দর ফুল!

'আম্মাজি, ফুল পাইরা দিব?'

'না। গাছের ফুল গাছেই থাক। আচ্ছা ঠিক আছে, দিন তো কয়েকটা ফুল। আপনি তো গাছে উঠতে পারবেন না — ফুল পাড়বেন কি ভাবে?'

'আম্মাজি, আমি পাইরা পাঠাইয়া দিমু।'

'আচ্ছা।'

শাহানা হাঁটছে। গ্রামের বৌ-ঝিদের কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে — কিন্তু কেউ তাকে বিরক্ত করছে না। হাঁটতে হাঁটতে শাহানার মনে হল — এই গ্রামের মানুষগুলি এত হত-দরিদ্র কেন? ঘরবাড়ির কি অবস্থা! আহা রে, একটু কিছু যদি এই মানুষগুলির জন্যে করা যেত!

একটা বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। ব্যাকুল হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে কাঁদছে। শাহানা থমকে দাঁড়াল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ভেতর থেকে ঘোমটা দেয়া একজন বৃদ্ধা মহিলা বের হয়ে এলেন।

বৃদ্ধা গাঢ় আন্তরিকতার স্বরে বললেন, আমার বাড়ির সামনে আইস্যা দাঁড়াইছেন কি যে খুশি হইছি আম্মা।

শাহানা বলল, কাঁদছে কে?

'আমার ছেলের বৌ কানতাছে আম্মা।'

'কেন?'

'আপনেরে দেইখ্যা কানতাছে।'

'আমাকে দেখে কাঁদছে কেন?'

'বউটার বড় ছেলেটা গত মাসে চাইর দিনের জ্বরে মারা গেছে। আম্মা,

আপনেরে দেইখ্যা এই জন্যে কানতাছে। যদি এক মাস আগে আইতেন, ছেলেটা বাঁচত।"

শাহানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বউটার হাহাকার সহ্য করা যায় না। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বিনিয়ে বিনিয়ে বলছে — আল্লাহ, রাজবাড়ির কন্যারে তুমি আইজ কেন পাঠাইলা? তুমি ক্যান এক মাস আগে পাঠাইলা না! . . .

শাহানার চোখে পানি এসে গেল। তার জন্যে সে লজ্জিতও হল না। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল, আপনি আপনার বৌমাকে বুঝিয়ে বলবেন — জীবন এবং মৃত্যু আল্লাহ ঠিক করে রাখেন। মানুষের কিছুই করণীয় নেই।

শাহানা জানে সে ভুল কথা বলেছে। মানুষের অনেক কিছুই করণীয় আছে — মানুষের আছে রোগব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তিশালী সব হাতিয়ার। মৃত্যুর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে মানুষ আজ উঁচু গলায় বলতে পারে — "বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী।"

বৃদ্ধা বললেন, মা, আপনি একটু ঘরে পা দিবেন না?

"জ্বি-না। আপনার বউমার কান্না শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে। দেখছেন না আমার নিজের চোখে পানি এসে গেছে!"

"আম্মাগো, বড় খুশি হইছি, আপনি যে আমার বাড়ির সামনে দাঁড়াইছেন — বড় খুশি হইছি! এখন কই যাইবেন আম্মা?"

"কোথাও যাব না, পথে পথে হাঁটব।"

শাহানা কিছুক্ষণ পথে পথে হাঁটল — তারপর উপস্থিত হল মতির বাড়িতে। মতির আবার জ্বর এসেছে। সে কুণ্ডুলি পাকিয়ে নোংরা বিছানায় শুয়ে আছে। শাহানাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসল।

শাহানা বলল, আজ আমার মনটা খুব খারাপ। আপনি একটা আনন্দের গান গেয়ে আমার মন ভাল করে দিন। আমি আপনার গান শুনতে এসেছি।

মতি বলল, আনন্দের গান শুইন্যা মনের দুঃখ দূর হয় না। মনের দুঃখ দূর করতে দুঃখের গান লাগে।

"বেশ, একটা দুঃখের গান গান।"

মতি সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল —

"কে পরাইল আমার চউক্ষে কলংক কাজল?"

কুসুম সকালে এসে মতির জ্বর দেখে গিয়েছিল।

সে এক বাটি সাগু নিয়ে ঘরে ঢুকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখল — রাজবাড়ির মেয়ে চৌকিতে পা তুলে ধ্যানী মূর্তির মত বসে আছে। মতি মিয়া চোখ বন্ধ করে গলা ছেড়ে গাইছে — "কে পরাইল আমার চউক্ষে কলংক কাজল।"

কুসুম কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

২১

মোহসিন একাই এসেছে। তার চোখে সানগ্লাস, গায়ে হালকা নীল রঙের টি শার্ট। পরনের প্যান্টের রঙ ধবধবে শাদা, পায়ের জুতা জোড়াও শাদা চামড়ার। সে বজরার ছাদে পাতা চেয়ারে বসে আছে।

নীতু দেখতে পেয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামছে। ঘাটের মাথায় ইরতাজুদ্দিন দাঁড়িয়ে। তিনি কৌতূহলী চোখে ছেলেটিকে দেখছেন। মানুষের সবচে' বড় পরিচয় তার চোখে। ছেলেটি তার চোখ কালো চশমায় ঢেকে রেখেছে, তারপরেও ইরতাজুদ্দিন বললেন, বেশ ছেলে তো !

নীতু লাফিয়ে বজরায় উঠে চেঁচিয়ে বলল, মিতু আপা কোথায় ?

মোহসিন বলল, তোমার মিতু আপা আসেনি। আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যে।

'আপনি কেমন আছেন মোহসিন ভাই?'

'ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভাল।'

'তোমার আপা, সে কেমন আছে?'

'খুব ভাল আছে। সমানে ডাক্তারি করে বেড়াচ্ছে।'

'ঘাটে যে বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই কি তোমার দাদা?'

'হুঁ। দারুণ রাগী। নেমেই আপনি কিন্তু পা ছুঁয়ে উনাকে সালাম করবেন।'

'আর কি করতে হবে?'

'সানগ্লাস খুলে ফেলুন। দাদাজন খুব প্রাচীন ধরনের মানুষ। সানগ্লাসকে তাঁরা অভদ্রতা মনে করেন।'

ইরতাজুদ্দিন ছেলেটির ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। সে তাঁর কাছে এসেই চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলেছে — নিচু হয়ে কদমবুসি করেছে। ইরতাজুদ্দিন স্পষ্ট গলায় বললেন, কেমন আছ মোহসিন?

'ভাল। খুব ভাল।'

'রাস্তায় অসুবিধা হয়নি তো?'

'জ্বি-না। শুধু নৌকা যখন হাওড়ে পড়েছে তখন ভয় পেয়েছি। একেবারে

সমুদ্রের মত ঢেউ।'

'তুমি এসেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি। বৃদ্ধ মানুষের নিমন্ত্রণ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মিতু এল না কেন?'

'ওর কি জানি একটা পরীক্ষা। ও ফ্রেন্চ শিখছে — তারই ডিপ্লোমা পরীক্ষা।'

'বাঙালী মেয়ের ফ্রেন্চ শেখার দরকার কি? এখন ফ্রেন্চ শেখাটাই ফ্যাশন না-কি?'

মোহসিন হাসল। বুড়ো ভদ্রলোককে যতটা প্রাচীনপন্থি বলে নীতু ভয় দেখিয়েছে ততটা বোধ হয় না।

ইরতাজুদ্দিন বললেন, শহরে থেকে অভ্যাস, গ্রামের বাড়িঘর তোমার পছন্দ হবে কি-না কে জানে। এসো মোহসিন, এসো।

বাড়ি দেখে মোহসিন হকচকিয়ে গেল। এ তো ছোটখাট প্যালেস। কাঠের এত বড় দোতলা বাড়ি বাংলাদেশে দ্বিতীয়টি আছে কি-না তার সন্দেহ হল। নীতু তাকে বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে —

এটা হচ্ছে নামাজঘর। ঐ যে ছোট্ট পাটিটা দেখছেন ঐ টা হাতীর দাঁতের পাটি। ঐ যে র‍্যাক দেখছেন — র‍্যাক ভর্তি কোরান শরীফ। এর মধ্যে একটা কোরান শরীফ আছে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিজের হাতের লেখা।

'সত্যি?'

'অবশ্যই সত্যি। আসুন আপনাকে লাইব্রেরি ঘর দেখাই। লইব্রেরি ঘর দেখলে আপনার চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। দুঃখের ব্যাপার কি জানেন, এত বড় লাইব্রেরির কিন্তু বাচ্চাদের কোন বই নেই।'

'তোমার জন্যে তো দুঃখেরই। প্রতিদিন তিনটা করে বই না পড়লে তো তোমার ঘুম হয় না। ভাল কথা, শাহানা কোথায়?'

'কে জানে কোথায়। ঘুরছে মনে হয়।'

'কোথায় ঘুরছে?'

'গ্রামের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপার সম্প্রতি হন্টন রোগ হয়েছে। সকালে নাশতা খেয়ে হাঁটতে বের হয় — দুপুরে আসে। প্রথম দিকে দাদাজান একা বেরুতে নিষেধ করেছিলেন। এখন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।'

'আসুন, লাইব্রেরিটা দেখবেন না?'

'খানিকক্ষণ পরে দেখলে কেমন হয় নীতু? খুব ক্লান্ত লাগছে — সাবান মেখে গোসল সেরে চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকব। তারপর তুমি যা দেখাবে তাই

দেখব। গোসলের জন্যে কেউ কি আমাকে একটু গরম পানি করে দিতে পারবে?"

"হ্যাঁ পারবে।"

"আমি কোন ঘরে থাকব একটু দেখিয়ে দাও।"

"আপনি থাকবেন দোতলায়। আসুন ঘর দেখিয়ে দেই।"

"মিতু তোমার জন্যে গল্পের বই দিয়ে দিয়েছে, চকলেট দিয়ে দিয়েছে। গরমে চকলেট গলে গেছে বলে আমার ধারণা।"

"চিঠি দেয়নি?"

"হ্যাঁ, চিঠিও দিয়েছে। এসো তোমাকে সব দিয়ে দিচ্ছি।"

"আপনি কি গোসলের আগে চা খাবেন?"

"শাহানার মত সেকেন্ডে সেকেন্ডে চা খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। আমি গোসল করেই শুয়ে পড়ব। খাঁটি বাঙালীর মত সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমুব।"

"সে কি! দুপুরে খাবেন না?"

"উহুঁ, ঠিক একটার সময় আমি সঙ্গে করে আনা স্যান্ডউইচ খেয়েছি, পনীর খেয়েছি, আপেল খেয়েছি। কাজেই আমার দুপুরের মিল অফ।"

"শুনলে দাদাজানের খুব মন খারাপ হবে। আপনার কথা ভেবেই দাদাজান রাক্ষস সাইজের এক কাতাল মাছ এনেছেন।"

"কোন উপায় নেই নীতু। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমি কঠিন নিয়ম মেনে চলি। তোমার উপর দায়িত্ব হল তোমার দাদাজানকে এটা বুঝিয়ে বলা। বলতে পারবে না?"

"হুঁ পারব।"

"তুমি খুব চমৎকার একটা মেয়ে নীতু। থ্যাংক য়্যু ফর অল দ্যা হেল্প।"

শাহানা বাড়িতে ফিরল দুপুর পার করে। তার জন্যে না খেয়ে ইরতাজুদ্দিন সাহেব এবং নীতু দুজনই অপেক্ষা করছিল। শাহানা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, আমি কিছু খাব না দাদাজান। আপনারা খেয়ে নিন।

ইরতাজুদ্দিন বললেন, খাবি না কেন?

"ইচ্ছা করছে না।"

"শরীর খারাপ করেনি তো?"

"না, শরীর ভাল আছে।"

"মুখ এত শুকনা লাগছে কেন?"

"রোদে রোদে ঘুরেছি এই জন্যেই মুখ শুকনা লাগছে।"

"কিছুই খাবি না?"

'না। তবে আপনার বিখ্যাত পেঁপে একটু খেতে পারি।'

নীতু বলল, তোমার জন্যে সুসংবাদ আছে আপা। মোহসিন ভাই এসেছেন। গোসল করে তাঁর ঘরে ঘুমুচ্ছেন। সন্ধ্যার আগে তাঁকে ডাকা যাবে না।

'মিতু আসেনি?'

'না, চিঠি পাঠিয়েছে। তোমার টেবিলের উপর রেখে দিয়েছি।'

শাহানা তার নিজের ঘরের দিকে রওনা হল। ইরতাজুদ্দিন লক্ষ্য করলেন, মোহসিন এসেছে এই সংবাদে তাঁর নাতনীর চেহারায় কোন পরিবর্তন হয়নি। কপালে সূক্ষ্ম ভাজ শুধু পড়েছে। বিরক্ত হলেই মানুষের কপালের চামড়া এভাবে কুঁচকে যায়। মেয়েটার কি কোন সমস্যা হয়েছে?

বাটি ভর্তি পেঁপে দিয়ে গেছে। পেঁপের সঙ্গে এক গ্লাস দুধ, এক গ্লাস পানি। শাহানা তার কোন কিছুই স্পর্শ করল না। সে মিতুর চিঠি পড়ছে। যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে পাঠ্যবই পড়ে ঠিক একই মনোযোগের সঙ্গে সে মিতুর চিঠি পড়ছে। মিতুর হাতের লেখা কাঁচা। প্রচুর বানান ভুল — কিন্তু চিঠিটা খুব গোছানো —

আপা,

তোমার চিঠি সব মিলিয়ে দশবার পড়লাম। আর কয়েকবার পড়লে মুখস্থ হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। কাজেই ঠিক করেছি আর পড়ব না। তোমার চিঠির জবাব পরে দিচ্ছি, আগে জরুরী খবরগুলি দিয়ে নেই।

জরুরী খবর নাম্বার ওয়ান — জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্টস এডভাইজার তোমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। তুমি ডরমিটরিতে থাকতে চাও না নিজে বাসা ভাড়া করে থাকতে চাও তা তোমাকে অতি দ্রুত জানাতে বলেছেন।

জরুরী খবর নাম্বার টু — তোমার অতি শখের তিনটি ক্যাকটাসই মারা গেছে। আমি তাদের বাঁচিয়ে রাখার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। বলধা গার্ডেনের একজন এক্সপার্ট পর্যন্ত খবর দিয়ে এনেছি, লাভ হয়নি।

জরুরী খবর নাম্বার থ্রি — আমাদের বাড়িতে ভূতের উপদ্রপ হচ্ছে। আমার বাথরুমটার কল আপনাআপনি খুলে যায়। ছরছর করে পানি পড়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় পানি দিয়ে কে যেন হাত-মুখ ধুচ্ছে। তুমি তোমার অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে নিশ্চয়ই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে — আমি পারছি না। আমি ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে বর্তমানে ছোট মামার বাড়িতে আছি। ছোট মামীর কথাবলা রোগ আরো বেড়েছে। তিনি ক্রমাগত আমার কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করে যাচ্ছেন। এখন মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভূতের বাড়িতে থাকাই ভাল ছিল। ভূতটা আর যাই করুক ক্রমাগত

কথা বলে না। কল খুলে মাঝে মাঝে শুধু হাত–মুখ ধোয়।

যাই হোক আপা, এখন তোমার চিঠির জবাব দিচ্ছি। যদিও আমার জবাবের জন্য তুমি অপেক্ষা করছ বলে আমার মনে হয় না। তার প্রয়োজনও নেই। তোমার সমস্যা তুমি সবচে আগে টের পাবে এবং তোমার অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান করবে এটা আমি জানি। তোমার সমস্যা তুমি আমাকে স্পষ্ট করে বলোনি।

অনুমান করছি, তুমি জনৈক গ্রাম্য গায়কের প্রতি তীব্র দুর্বলতা পোষণ করছ। দুর্বলতা গানের জন্য হলে সমস্যার কোন কারণ নেই — দুর্বলতা মানুষটির জন্যে হলে অবশ্যই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

আমার ধারণা গ্রামের পরিবেশ, প্রকাণ্ড হাওড়, শ্রাবণ মাসের আকাশের মেঘ এবং ঝর ঝর বৃষ্টি, দাদাজানের রূপকথার রাজা–বাদশার মত কাঠের বাড়ি — সব তোমার উপর একটা প্রভাব ফেলেছে। মনে উদ্ভট সব খেয়াল জাগছে। এসব খেয়ালকে প্রশ্রয় দেবার প্রশ্নই উঠে না। গ্রামের গায়ক গ্রামেই থাকুক — গান গাইতে থাকুক। তুমি চলে যাও তোমার নিজের জায়গায়।

মনের দেয়াল ভেঙে বৈপ্লবিক কিছু করে ফেলার চিন্তা মেয়েরা ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সে করে। ঐ বয়স তুমি পার হয়ে এসেছ।

ঐ গায়কের গান শুনতে চাও খুব ভাল কথা, ক্যাসেট ভর্তি করে গান নিয়ে এসো। যখন শুনতে ইচ্ছা করবে, শুনবে। তার জন্যে গায়ককে নিয়ে আসতে হবে কেন?

আপা, আশা করি, আমার এই ধরনের রূঢ় কথা তোমাকে আহত করবে না। কথাগুলি রূঢ় হলেও সত্যি। সত্যকে গ্রহণ করার সাহস তোমার আছে।

মোহসিন ভাইকে বলতে গেলে আমি জোর করে পাঠিয়েছি। বেচারার এখানে অনেক কাজ ছিল। কাকতালীয়ভাবে উনি যেদিন সুখানপুকুর পৌছবেন সেদিন পূর্ণিমা। যদি আকাশে মেঘ না থাকে তাহলে শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা খুব সুন্দর হবার কথা। তুমি অবশ্যই পূর্ণিমার রাতে মোহসিন ভাইকে নিয়ে ছাদে বসবে। অনেক রাত পর্যন্ত দু'জন গল্প করবে।

চিঠি প্রায় শেষ। এখন শুধু জরুরী খবর নাম্বার ফোরটা বলি — তোমাদের বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে ২৭শে শ্রাবণ। কাজেই চলে এসো।

ইতি
মিতু

মোহসিন সন্ধ্যাবেলা ঘুম থেকে উঠল। নীতুই ঘুম থেকে তুলল — আর কত ঘুমুবেন? উঠুন, আপা আপনার সঙ্গে চা খাবে বলে চা না খেয়ে বসে আছে।

'ম্যারাথন ঘুম দিয়ে দিয়েছি, তাই না নীতু?'

'হুঁ।'

'খিদেও লেগেছে মারাত্মক।'

'খিদে লাগলেও আপনাকে কিছু খেতে দেয়া হবে না। এখন খেলে রাতে আবার ভাত খাবেন না।'

'তুমি তোমার আপাকে বল — আমি আসছি। সেজেগুজে নিজেকে প্রেজেন্ট করি। তোমরা যে আসলে রাজকন্যা তা তো জানতাম না। এখানে এসে জানলাম। রাজকন্যার সামনে তো আর গেঞ্জি গায়ে উপস্থিত হওয়া যাবে না।'

নীতু খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আমরা যে রাজকন্যা সেটা আমরাও জানতাম না। এখানে এসে জেনেছি।

মোহসিন হাসতে হাসতে বলল, তুমি এখন আমাকে একটা বুদ্ধি দাও। তোমার আপার সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন কি কুর্নিশ করতে হবে?

নীতু আবারো খিলখিল করে হেসে উঠল।

চা দেয়া হয়েছে বারান্দায়। শাহানা একা অপেক্ষা করছে। সন্ধ্যা নামছে ঘন হয়ে। টেবিলে কেরোসিনের বাতি আছে কিন্তু নেভানো। মোহসিনকে আসতে দেখে শাহানা হাসল। মোহসিন বলল, কেমন আছ "হার হাইনেস"?

'ভাল।'

'চোখের কোণে কালি, মুখ শুকনো। কি ব্যাপার বল তো? শরীর ভাল তো?'

'ডাক্তারকে কখনো জিজ্ঞেস করতে নেই শরীর ভাল কি-না।'

'সরি। তুমি যে একজন ডাক্তার মনেই থাকে না।'

শাহানা চা ঢালছে। মোহসিন বলল, শুধু চা দিচ্ছ? প্রচণ্ড খিদে লেগেছে।

'খিদে লাগলেও উপায় নেই। দাদাজানের নির্দেশ — বিকেলে তোমাকে যেন কিছু না দেয়া হয়। দুপুরে কিছু না খাওয়ায় উনি রেগে আছেন। তাঁর কাতল মাছের গতি হয়নি।'

'রাতে গতি হবে। কাতল মাছের দুঃখিত হবার কিছু নেই।'

শাহানা হাসতে হাসতে বলল, রাতে অন্য মাছ।

'সে কি!'

'রাজবাড়ির কাণ্ডকারখানা অন্য রকম।'

'সিগারেট খাওয়া যাবে তো? না-কি সিগারেট খেতে দেখলে তোমার দাদাজান রাগ করবেন?'

'রাগ করবেন না, খাও।'

মোহসিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, মিতু আমাকে প্রায় জোর করে পাঠিয়েছে। আমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া। মিতুর ধারণা, তোমাকে এই মুহূর্তে গ্রেফতার করে নিয়ে না গেলে তুমি আর যাবে না, থেকে যাবে।

'মিতুর ধারণা ঠিক না, আমি যাব।'

'কবে যাবে?'

'তুমি যখন যেতে বলবে। তুমি কবে যেতে চাও?'

'আমি তো এক্ষুণি যেতে চাই। প্রচণ্ড সব ঝামেলা ফেলে এসেছি। যাই হোক, কাল দুপুরের দিকে রওনা হলে রাতে ঢাকা পৌঁছতে পারি। তোমার অসুবিধা আছে?'

'না, অসুবিধা নেই।'

'এই সময়ের মধ্যে হার হাইনেসের রাজত্ব যতটা পারি দেখে নেব। দেখার কিছু কি আছে এখানে?'

'ছোট একটা দীঘি আছে। চারদিক কদমগাছে ঘেরা। শুধু যে অপূর্ব তাই না, মনে হয় জায়গাটা বেহেশতের একটা অংশ ছিল, ভুলে পৃথিবীতে চলে এসেছে। দীঘিটার নাম হল "অশ্রুদীঘি"।'

'বল কি! গ্রামের এক দীঘির এ রকম কাব্যিক নাম? কে রেখেছে এই নাম?'

'আমি।'

'তুমি?'

'হুঁ। আমি।'

'এত সুন্দর দীঘি যদি হয় তার নাম অশ্রুদীঘি হবে কেন?'

'দীঘিটা দেখলে আনন্দে চোখে পানি এসে যায়, এই জন্যেই তার নাম রেখেছি অশ্রুদীঘি।'

মোহসিন দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তোমার মধ্যে যে এমন প্রবল কাব্য ভাব আছে তা জানতাম না।

শাহানা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি নিজেও জানতাম না। এখানে এসে অনেক কিছু জেনেছি।

'যেমন?'

'যেমন, আগে ভাবতাম আমার স্বপ্ন হচ্ছে পৃথিবীর বড় ডাক্তারদের মধ্যে একজন হওয়া। এখানে এসে মনে হল এটা ভুল স্বপ্ন। আমার আসল স্বপ্ন অন্য।'

'আসল স্বপ্ন কি?'

'আসল স্বপ্ন গ্রাম্য একটা গানের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পথে পথে গান গাওয়া — 'কে পরাইল আমার চউক্ষে কলংক কাজল।'

'মিতু ঠিকই বলেছে — দ্রুত তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়া উচিত।'

শাহানা অস্পষ্ট গলায় বলল, সব মানুষের মধ্যে নানান ধরনের স্বপ্ন থাকে। তার মধ্যে কোন্‌টা সত্যি স্বপ্ন কোন্‌টা মিথ্যে স্বপ্ন সে ধরতে পারে না। মানুষ সব সময়ই বাস করে একটা বিভ্রমের ভেতর।

মোহসিন হাসতে হাসতে বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এক্ষুণি তোমাকে নিয়ে ঢাকা রওনা হওয়া উচিত।

শাহানা হাসল। মোহসিন বলল, যাক, অনেকক্ষণ পর তোমার হাসি দেখলাম।

'আগে একবার হেসেছি, তুমি লক্ষ্য করনি।'

মোহসিন বলল, তোমার কথাবার্তা খুব হাই ফিলসফির দিকে টার্ন করছে। সহজ কথাবার্তা কিছু বলা যায় না?

'যায়। চকোলেট রঙের এই শার্টে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে এবং তুমি যে এত সুপুরুষ তা ঢাকায় থাকতে বুঝতে পারিনি।'

'থ্যাংকস। এই তো, এখন কথাবার্তাগুলি শুনতে ভাল লাগছে। চল, তোমার অশ্রুদীঘি দেখে আসি।'

'এখন না। আরেকটু পরে চল। আজ পূর্ণিমা। চাঁদ উঠুক, তারপর যাব।'

'অশ্রুদীঘির চারপাশে আমরা যদি হাত ধরাধরি করে হাঁটি তাহলে গ্রামের লোক কিছু মনে করবে না তো?'

'না। আচ্ছা, তুমি কি গান শুনবে?'

'কে গাইবে? তুমি?'

'না। আমি গান জানি না-কি? এখানে একজন গায়ক আছেন — মতি — উনাকে খবর দিলে . . .

'কাউকে খবর দিতে হবে না। আমরা হাত ধরাধরি করে অশ্রুদীঘির চারপাশে হাঁটব। গানের দরকার হবে না। আমাদের সবার ভেতর গান আছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে সেই গান আপনাআপনি কানে বাজতে থাকে . . . দেখলে তো, দার্শনিক কথাবার্তা আমিও বলতে পারি।'

মোহসিন আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠে গেছে — এখনো আলো ছড়াতে শুরু করেনি। শাহানা অপেক্ষা করছে।

মোহসিন বলল, রাজকন্যা তুমি কি আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে?

'হাঁটু গেড়ে বস তারপর হাসব।'

মোহসিন সত্যি সত্যি হাঁটু গেড়ে বসতে গেল। শাহানা হাত ধরে থামাল।

২২

আকাশে প্রকাণ্ড থালার মত চাঁদ উঠেছে। জোছনার প্লাবনে থৈ থৈ করছে সুখানপুকুর। তরল জোছনা, মনে হয় ইচ্ছে করলেই এই জোছনা গায়ে মাখা যায়।

জোছনা গায়ে মেখে কুসুম জলচৌকিতে একা একা বসে আছে। সে সন্ধ্যা থেকেই কাঁদছে। তার ভেজা গালে জোছনা চক চক করছে। কুসুমের কান্না বাড়ির সবাই দেখছে কেউ গায়ে মাখছে না। বিয়ের কন্যাতো কাঁদবেই। কাঁদাটাইতো স্বাভাবিক।

কুসুমের বিয়ে ঠিক হয়েছে আজ বিকেলে। তার বড় খালা হুট করেই সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। মনোয়ারাকে ডেকে বললেন, গরীব ঘরের মেয়ের বিয়া। জামাই হাতীর পিঠে চইড়া আসব না। জামাই ঘরে বসা। জিনিশটা ভাল দেখায় না। মৌলবী ডাক দিয়া কবুল দিয়া দেও। এজিন কাবিন হইয়া থাকুক। পরে এক সময় গেরামের মানুষের খাওয়াটা দিবা।

মনোয়ারা বলেছেন — আফনে যেটা ভাল বিবেচনা করেন।

'আমি এইটাই ভাল বিবেচনা করি।'

'ছেলেরে জিজ্ঞেস করা দরকার না বুবু তার একটা মতামত।'

'জিজ্ঞেস করতাছি।'

কুসুমের খুব আশা ছিল ছেলে রাজী হবে না। শখ করে কে চাইবে জ্বীনে পাওয়া মেয়েকে বউ করতে। কুসুমকে অবাক করে দিয়ে সুরুজ আলি মিনমিন করে বলল, আফনে আমার মা'র মত। আফনে যা নির্ধারন করবেন . . .

নিন্দালিশের খালা বললেন, আইজ পূর্ণিমা । পূর্ণিমা'র দিন বিবাহ সুখের হয় না। কাইল একজন মৌলবী খবর দিয়া আনি। দশ হাজার এক টাকা কাবিনে বিবাহ রাজি আছ?

সুরুজ আলি পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল, আফনে আমার মুরুব্বী।

তিনি একশ টাকার দু'টা নোট বের করে দিয়ে বললেন, পায়জামা, পাঞ্জাবী আর টুপী কিনা আন। কালা টুপী কিনবা না।

কুসুমকে হতভম্ভ করে সুরুজ আলি টাকা নিয়ে পায়জামা, পাঞ্জাবী কিনতে চলে গেল। তারপরেও কুসুমের মনে ক্ষীণ আশা ছিল হয়ত টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। খালি হাতে পালিয়ে যাবার চেয়ে টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া ভাল।

সুরুজ আলি পালায় নি। সন্ধ্যার আগেই ফিরেছে। নাপিতের দোকানে চুল কাটিয়েছে।

মৌলবী ডাকিয়ে তিনবার কবুল বলিয়ে যে বিয়ে হবে তারও আয়োজন লাগে। কুসুমের বাড়ির সবাই সেই আয়োজনে ব্যস্ত। আশে পাশের বাড়ির মেয়েরাও এসে জুটেছে। চিকণ করে সুপারী কাটা হচ্ছে। পানের খিলি বানানো হচ্ছে। হাতের সেমাই বানানোর জন্যে চালের গুড়ি তৈরী হচ্ছে। পুষ্পের খুব শখ মাঝ রাত থেকে বিয়ের গীত হবে। সে গেছে বিয়ের গীতের মানুষ জোগাড় করতে। বিয়ের গীতের আসল মানুষ মরিয়মের মা। খবর পেলেই তিনি চলে আসবেন। সাপের ওঝার যেমন সাপে কাটা রুগীর খবর পেলেই আসতে হয়। বিয়ের গীত যারা গায় তাদেরও তেমনি বিয়ের খবর পাওয়া মাত্র ছুটে আসতে হয়।

মরিয়মের মা এলেই পাড়ার বাকি বৌ–ঝি'রা আসতে শুরু করবে। মাঝ রাতের পর চারদিকে নিস্তব্ধ হয়ে গেলে শুরু হবে বিয়ের গান। একজন গাইবে বাকিরা ধোয়া ধরবে —

আইজ আমরার কুসুম বেটির বিবাহ হইব।
বিবাহ হইব। বিবাহ হইব।
হাসিয়া রঙ্গিলা কুসুম পিড়িতে বসিব
বিবাহ হইব। বিবাহ হইব।
পিড়িতে বসিয়া কুসুম সিনান করিব
বিবাহ হইব। বিবাহ হইব।
সিনান করিয়া পায়ে আলতা পরিব
বিবাহ হইব। বিবাহ হইব।

কুসুম জলচৌকি থেকে উঠল। হঠাৎ তার ভেতর সামান্য অস্থিরতা দেখা গেল। সে চোখের পানি মুছে ফেলল। সবাই ব্যস্ত। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। এই ফাঁকে চট করে মতি ভাইকে দু'টা কথা বলে আসা যায়। কতক্ষণ আর লাগবে দু'টা কথা বলতে। যাবে আর আসবে। বিয়ের কনেকে চোখে চোখে রাখার নিয়ম। কুসুমকে কেউ চোখে চোখে রাখছে না।সে পাঁচ দশমিনিটের জন্যে চলে গেলে কেউ দেখবে না।

মতির জ্বর বেড়েছে। সে কাঁথা গায়ে শুয়ে ছিল। হারিকেন জ্বালায় নি। খোলা দরজা ও জানালা গলে চাঁদের আলো এসে ঘর আলো হয়ে আছে। কুসুম দরজা ধরে দাঁড়াতেই মতি চমকে উঠে বলল, কে?

কুসুম খুব নরম স্বরে বলল, আমি মতি ভাই।

'কি ব্যাপার কুসুম?'

'আফনের জ্বর কেমন দেখতে আসছি। কাইল আমার বিবাহ। বিবাহের পরে তো আর যখন তখন আসন যাইব না। আফনের জ্বর কি বাড়ছে মতি ভাই।'

'হুঁ।'

কুসুম সহজ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল। মতির কপালে হাত রেখে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, জ্বরে তো শইল পুইড়া যাইতেছে।

মতি গম্ভীর গলায় বলল, রাইত কইরা তুমি আসছ কাজটাতো ভাল কর নাই কুসুম।

'আমার ভাল-মন্দ আফনের দেখনের দরকার নাই। নিজের ভাল-মন্দ দেখেন। রাজবাড়ির মেয়েরে খবর দেন নাই। খবর পাইলে সে দৌড়াইয়া আইস্যা চিকিৎসা শুরু করব। আফনেরে সে খুব ভাল পায়।'

'তুমি ভাল পাও না?'

'আমার ভাল পাওনে না পাওনে কিছু হয় না। আমি কে মতি ভাই। আমি কেউ না।'

কুসুম খাটে বসল। মতি আতংকিত গলায় বলল — বাড়িত যাও কুসুম। বসলা যে? কাইল তোমার বিবাহ এই খবর পাইছি। বিয়ার কন্যা হইয়া . . .

'আফনেরে দুইটা কথা কইতে আইছি মতি ভাই। কথা দুইটা শেষ হইলেই এক দৌড় দিয়া চইল্যা যাব।'

'কি কথা?'

'ব্যাঙের মাথা।'

'তামাশা করবা না কুসুম। যা বলনের বল — বইল্যা বাড়িতে যাও।'

কুসুম মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বলল, মতি ভাই আফনে আমারে একটু আদর কইরা দেন।

মতি স্তম্ভিত হয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ কুসুম। তুমি কি বলতেছ? এইসব কি কথা?

কুসুম ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি হইলাম জ্বীনে ধরা মেয়ে। কোন সময় কি বলি কোন ঠিক নাই। ভুল হইলে মাফ কইরা দেন।

'ভুলতো অবশ্যই হইছে। এইসব পাপ চিন্তা মনে স্থান দিবা না। তুমি জান না তোমারে আমি অত্যাধিক স্নেহ করি।'

'সত্যি?'

'অবশ্যই সত্য। যাও অখন বাড়িত যাও।'

'যদি না যাই?'

মতি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মেয়েটা এইসব কি শুরু করেছে? জ্বীন তাকে দিয়ে এইসব করাচ্ছে। ভরা পূর্ণিমায় জ্বীনের আছর বেশী হয়।

মতি ভাই, আমি ঠিক করছি এই চৌকির উপরে বইস্যা থাকব। লোকজন এক সময় আমার খুঁজে বাইর হইব। খুঁজতে খুঁজতে আমারে পাইব আন্ধ্যাইর ঘরে বসা।

কুসুম হাসছে। খিল-খিল করে হাসছে। স্বাভাবিক মানুষের হাসি না —

অস্বাভাবিক হাসি। যে হাসি শুনলে গা ঝিম ঝিম করে।

'মতি ভাই?'

'হুঁ।'

'আফনে কোন দিন বিবাহ করবেন না?'

'না। আমার ওস্তাদের নিষেধ আছে। ওস্তাদ আমারে স্পষ্ট কইরা বলছে — সংসার আর গান দুইটা এক লগে হয় না। হয় সংসার করবা নয় গান।'

'আফনের ওস্তাদ তো বিবাহ করছিল। করে নাই?'

'হ্যাঁ করছে। এই জন্যেই তো তার গলাত গান বসে নাই।'

'আফনের গলাত গান বসছে?'

'হ্যাঁ কুসুম বসছে। তুমি নিজেও জান বসছে। আমি গানে টান দিলে মাইনষের চউক্ষে পানি আয়। কি জন্যে আয়?'

কুসুম শান্ত গলায় বলল, হ্যাঁ মতি ভাই। আফনের গলায় গান বসছে। কথা সত্য।

মতি আগ্রহের সঙ্গে বলল, এর জন্যে কষ্ট আমি কম করি নাই। অনেক কষ্ট করছি। মনে সুখ থাকলে গান হয় না — এই জন্যে সুখের আশা কোন দিন করি নাই।

মতির কথার মাঝখানেই কুসুম হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই মতি ভাই। তার গলার স্বরে আগের শান্ত ভাব নেই। তার গলা ভেজা।

'আও তোমারে আগাইয়া দেই।'

'আগাইয়া দেওনের দরকার নাই। কে না কে দেখব।'

মতিও ঘর থেকে বের হল। তার বাড়ির উঠান জোছনায় ভরা। কুসুম বলল, কি চান্নি পসর দেখছেন মতি ভাই। এমন চান্নি কোনবার দেখি নাই।

বলতে বলতে কুসুম শব্দ করে হাসল। মতি বলল হাস কেন?

'মাইনষে যেমন বৃষ্টির মইধ্যে গোসল করে আমার জোছনার মইধ্যে গোসল করনের ইচ্ছা করতেছে। গোসল করবেন মতি ভাই?'

'তুমি যে কি পাগলের মত কথা কও।'

কুসুম ধরা গলায় বলল, আর কোন দিন আফনেরে বিরক্ত করব না মতি ভাই। আইজ আমার কথা শুনেন, আইয়েন উঠানে দাঁড়াইয়া দুইজনে জোছনার মইধ্যে গোসল করি। শইল্যে চান্নি পসর মাখি।

'বাড়িত যাও কুসুম।'

কুসুম ক্লান্ত গলায় বলল, আচ্ছা যাইতেছি।

কুসুম দ্রুত পায়ে চলে গেল। মতির ঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না। সে উঠোনে বসে রইল। এক সময় কুসুমের মত তারো জোছনায় গোসল করতে ইচ্ছা করতে লাগল। কি আশ্চর্য জোছনা।

২৩

শাহানা ঢাকায় রওনা হবে দুপুরের পর। সন্ধ্যা বেলায় ঠাকরোকোনা থেকে ঢাকা যাবার ট্রেন ধরবে। ঠাকরোকোনা পর্যন্ত যাবার জন্যে ইঞ্জিনের নৌকা আনানো হয়েছে। সকাল থেকেই নৌকায় তোষক বিছিয়ে বিছানা করা হচ্ছে। নীতুর খুব মন খারাপ। জায়গাটা তার মোটেও ভাল লাগে নি। এই দশদিন নিজেকে সত্যি সত্যি বন্দিনী মনে হয়েছে। এখন যাবার সময় হয়েছে এখন শুধু কান্না পাচ্ছে। সে শাহানাকে গিয়ে বলল, আপা এই যে আমরা চলে যাচ্ছি, তোমার খারাপ লাগছে না?

শাহানা বলল, না খারাপ লাগছে না। ভাল লাগছে।

'আমার খুব খারাপ লাগছে আপা। আমার মনে হয় যাবার সময় আমি দাদাজানকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলব। কি বিশ্রী কাণ্ড হবে।'

'বিশ্রী কাণ্ড হবে কেন?'

'মোহসিন ভাই নিশ্চয়ই এই নিয়ে পরে আমাকে ক্ষ্যাপাবে।'

'সেই সম্ভাবনা তো আছেই। পৃথিবীর সব দুলাভাইরা মনে করে শালীদের ক্ষ্যাপানো তাদের পবিত্র দায়িত্ব।'

'আপা, তুমি কি শেষবারের মত আজ বেড়াতে বের হবে না, সুখানপুকুর হেঁটে হেঁটে দেখবে না?'

'দেখতে পারি। সম্ভাবনা আছে।'

নীতু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপা দাদাজান আজ সকাল থেকে কিছু খাননি। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন, তা-কি তুমি জান?'

'জানি।'

'দাদাজানের খুব মন খারাপ।'

'মন খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। এতদিন এক সঙ্গে ছিলাম হৈ চৈ করেছি — এখন আবার খালি হয়ে যাবে। তিনি বিশাল খালি বাড়ি একা একা পাহারা দেবেন।'

শাহানা শেষবারের মত সুখানপুকুর দেখতে বের হবে। মোহসিন বলল, আমি কি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি। প্রিন্সেসের সঙ্গে এসকর্ট থাকবে না তা কি করে হয়। আসব তোমার সঙ্গে?

'অবশ্যই আসবে। একটু অপেক্ষা কর আমি দাদাজানের সঙ্গে বিদায় দেখাটা করে আসি।'

মোহসিন বলল, এখন তো বিদায় নিচ্ছ না। বিদায় নিতে তো দেরী আছে।

শাহানা হাসতে হাসতে বলল, ঐ পর্বটা আমি আগেই সেরে রাখতে চাই। আমার ধারণা বিদায় মুহূর্তে নীতু দাদাজানকে জড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকবে। তাকে দেখে আমি কাঁদতে থাকব। সুন্দর করে বিদায় নেয়া হবে না।

'তোমরা তিন বোনই খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টর। আমি লেখক হলে তোমাদের তিনজনকে নিয়ে চমৎকার একটা উপন্যাস লিখতাম। নাম দিতাম "old man and these grand daughters."

শাহানা ইরতাজুদ্দিন সাহেবের ঘরে ঢুকল। দরজা ভেজানো ছিল। শাহানা ঘরে ঢুকে আগের মত দরজা ভিজিয়ে দিল।

ইরতাজুদ্দিন ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। পুরানো দিনের ভারী ইজিচেয়ার। হাতলে অনায়াসে বসা যায়, শাহানা ইজিচেয়ারের হাতলে বসল। ইরতাজুদ্দিন বললেন, কিছু বলবি?

শাহানা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ইরতাজুদ্দিন বললেন, বল কি বলবি।

দাদীজানের যে ছবিটা আপনি আলমিরায় বন্ধ করে রাখেন ঐ ছবিটা দেখব। শুনেছি দেখতে অবিকল আমার মত। না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

ইরতাজুদ্দিন ছবি বের করে আনলেন। শাহানা অবাক হয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য মিল তো।

'এত সুন্দর একটা ছবি লুকিয়ে রাখেন কেন দাদাজান?'

'দেখতে কষ্ট হয় এই জন্যে আড়াল করে রাখি অন্য কিছু না। তুই এই ছবিটা নিয়ে যা — তোর বাবাকে দিস সে খুশী হবে। আমি যতদূর জানি তার কাছে তার মা'র কোন ছবি নেই।'

'আপনার এত প্রিয় একটা ছবি দিয়ে দিচ্ছেন?'

'প্রিয়জনকেতো প্রিয় জিনিস দিতে হয়। প্রিয়জনকে কি অপ্রিয় জিনিস দেয়া যায়?'

'বাবা খুব খুশী হবে।'

'তোর বাবাকে আরেকটা ব্যাপার বুঝিয়ে বলবি, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি একটা ভুল করেছিলাম। অনিচ্ছাকৃত ভুল। সব সময় একা থাকতাম। কেউ আসত না আমার কাছে —। এই সময় গানবোট নিয়ে একদল মিলিটারী উঠে এল . . .।'

'ঐ প্রসঙ্গটা থাক দাদাজান।'

'না, প্রসঙ্গটা শুনে রাখ। মিলিটারীদের আমার বাড়িতে উঠতে দেখে আমি খুশীই

হয়েছিলাম। ভাবলাম কিছুদিন বাড়িটা গমগম করবে। ওরা যে এই ভয়ংকর কাণ্ড করবে আমি চিন্তাও করি নি। তোর বাবাকে বলিস আমি আমার অপরাধ স্বীকার করি।'

'বাবাকে আমি অবশ্যই বলব।'

ইরতাজুদ্দিন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুই অসাধারণ একটা মেয়ে হয়ে পৃথিবীতে এসেছিস।

'এই কথা কেন বলছেন দাদাজান।'

'এই গ্রামের প্রতিটি মানুষ আমাকে ঘৃণার চোখে দেখতো। তোর কারণে সেই ঘৃণাটা এখন নেই। যে মানুষের এমন চমৎকার একটা নাতনী সেই মানুষকে ঘৃণা করা যায় না।'

'এমন করে বলবেন না-তো দাদাজান। আমার চোখে পানি এসে যাচ্ছে।'

'তুই আমার কাছে কিছু একটা চা। তুই যা চাইবি তাই তোকে দেব।'

'বর দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, বর ভাবলে বর।'

'একটা বরতো দেয়া যায় না দাদাজান — তিনটা করে বর দিতে হয়। আমি তিনটা জিনিস চাইব আপনি আমাকে দেবেন — রাজি আছেন?'

'আচ্ছা যা দেব। ক্ষমতায় থাকলে অবশ্যই দেব।'

'এক — আপনি ঢাকায় এসে আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'এটা পারলাম না। এই বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

'দুই — গ্রামের সব মানুষকে ডেকে আপনি যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একটা ভুল করেছিলেন সেই ভুলের কথা বলবেন। তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।'

'এটাও সম্ভব না।'

'তিন — আমাদের এই বাড়িটাকে আপনি দান করে দেবেন। এখানে একটা সুন্দর আধুনিক হাসপাতাল হবে।'

'এটাও সম্ভব না। পৈতৃক বাড়ি — আদি ঠিকানা। এই ঠিকানা নষ্ট হতে দেয়া যায় না। তুই অন্য কিছু চা।'

'আমার আর কিছু চাইবার নেই। দাদাজান আপনি বিশ্রাম করুণ আমি শেষবারের মত সুখানপুকুর দেখে আসি।'

ইরতাজুদ্দিন কিছুই বললেন না।

শেষবারের মত সুখানপুকুর ঘুরে দেখবে বলে শাহানা বের হয়েছিল। মোহসিন ক্যামেরা হাতে সঙ্গে আছে। কয়েক পা এগিয়েই শাহানা বলল, চল বাড়ি চলে যাই।

মোহসিন বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

'ভাল লাগছে না।'

মোহসিন হাসতে হাসতে বলল, তোমার সঙ্গে জীবন যাপন করা খুব যন্ত্রণার ব্যাপার হবে। তুমি দারুণ মুডি। অন্য কোথাও যেতে না চাইলে যেও না, চল তোমার প্রিয় জায়গাটার একটা ছবি নিয়ে আসি — অশ্রু দীঘি।

'না, না। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।'

মোহসিন লক্ষ্য করল শাহানার চোখ ভেজা। সে এই অদ্ভুত মেয়েটির গভীর আবেগের কোন কারণ ধরতে পারল না।

শাহানাদের নৌকায় তুলে দিতে এসে ইরতাজুদ্দিন হতভম্ভ হয়ে গেলেন। নৌকা ঘাট লোকে লোকারণ্য। সুখানপুকুরের সবাই কি চলে এসেছে? একি অস্বাভাবিক কাণ্ড।

নীতু ফিস ফিস করে বলল, আপা তুমি যদি এখান থেকে ইলেকশান কর নির্ঘাৎ তোমার বিপক্ষে যারা দাঁড়াবে সবার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

শাহানা হাসতে হাসতে বলল, তাই তো দেখছি।

মোহসিন বিস্মিত গলায় বলল, শাহানা তুমি এতগুলি মানুষকে মুগ্ধ করলে কোন কৌশলে? মাই গড! এরা সবাই তোমাকে 'সি অফ' করতে এসেছে ভাবতেই কেমন লাগছে। তুমি কি এদের সবার চিকিৎসা করেছ। এই ভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেক না। ওদের দিকে তাকিয়ে হাত টাত নাড়। নেতারা যে ভঙ্গিতে হাত নাড়েন সেই ভঙ্গিতে।

শাহানার চোখে পানি এসে গেছে। সে চোখের পানি সামলাতে গিয়ে আরো বিপদে পড়ল। এখন মনে হচ্ছে চোখ ভেঙ্গে বন্যা নামবে।

ইরতাজুদ্দিন শাহানার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তিনি হয়তবা শাহানাকে অস্বস্তি থেকে রক্ষা করার জন্যেই উঁচু গলায় বললেন — আপনারা সবাই আমার নাতনীদের জন্যে একটু দোয়া করবেন। ওর খুব ইচ্ছা আমার বাড়িটায় একটা হাসপাতাল হোক। ইনশাআল্লাহ্ হবে। আমি কথা দিলাম।

আপনাদের কাছে আরেকটা কথা — স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি একটা অন্যায় করেছিলাম। মিলিটারীদের আমার বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলাম। আমি ভয়ংকর অপরাধ করেছিলাম। আমি হাত জোড় করে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই।

ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির মধ্যে একটা বড় ধরনের গুঞ্জন উঠল। সেই গুঞ্জনও আচমকা থেমে গেল। ইরতাজুদ্দিন শাহানার দিকে তাকিয়ে বললেন — তোর তিনটা বরই তোকে দিলাম — এখন কান্না বন্ধ কর।

শাহানা কান্না বন্ধ করতে চেষ্টা করছে পারছে না।

২৪

কুসুম নৌকা ঘাটায় যায় নি। বিয়ের কনে বলেই তাকে যেতে দেয়া হয় নি। সে ভেতর বারান্দায় পাতা চৌকীর উপর আজ সারাদিন ধরেই প্রায় শুয়ে আছে। কুসুমদের বাড়ি থেকে পুষ্প গিয়েছিল। মনোয়ারার খুব শখ ছিল রাজবাড়ির মেয়েটাকে শেষবার দেখার। তাঁর ব্যথা হঠাৎ শুরু হওয়ায় যেতে পারেন নি।

পুষ্প ফিরল খুব মন খারাপ করে। কুসুম বলল, ঘাটে অত মানুষ দেইখ্যা রাজবাড়ির মেয়ে খুব খুশী, ঠিক না পুষ্প?

পুষ্প কিছু বলল না।

কুসুম বলল, উনি কি করতেছিলেন ? হাসতেছিলেন?

'না, খুব কানতেছিল।'

'মতি ভাই কি ঘাটে গেছিল?'

'উহুঁ।'

'নৌকা কতক্ষণ হইছে ছাড়ছে?'

'মেলা সময় হইছে।'

'ইঞ্জিনের নৌকা?'

'হু। এইতা জিগাইতেছ ক্যান?'

কুসুম হাসিমুখে বলল, কারণ আছেরে পুষ্প। কারণ আছে। আমি বিষ খাইব বইল্যা ঠিক করছি।

রাজবাড়ির মেয়ে থাকলে বিষ খাইয়া লাভ নাই, বাঁচাইয়া ফেলব। অখন বাঁচানির কেউ নাই।

'জ্বীনে ধরা কথা কইওনাতো বুবু।'

'জ্বীনে ধরা কথা না পুষ্প। একেবারে খাড়ি কথা। তুই মতি ভাইরে ডাইক্যা আন। সে দেখুক । ছটফট কইরা মরব। এই মরণ দেখলে তার কষ্ট হইব। কষ্ট হইলে তার গলা আরো সুন্দর হইব।'

'তামাশা কইর না বুবু।'

'আচ্ছা যা — তামাশা বন্ধ।'

কুসুম হাসছে। সেই হাসি পুষ্পের ভাল লাগছে না। সে ভীত গলায় বলল, বিষ

খাইবা না তো!'

'আরে দূর বোকা — বিষ খাওনের কি হইছে। বিয়ার কইন্যা বিষ খাইলে বিয়া ক্যামতে হইব?'

'তোমার কথাবার্তা যেন কেমুন কেমুন।'

কুসুম খিল খিল করে হাসছে। হাসির শব্দে বিরক্ত হয়ে ধমক দিতে গিয়ে মনোয়ারা ধমক দিলেন না। আহারে দুঃখী মেয়ে। মনের আনন্দে একটু হাসছে হাসুক। সে নৌকা ঘাটায় যেতে চেয়েছিল তিনি যেতে দেননি। এর জন্যেও মায়া লাগছে। যেতে দিলেই হত। মনোয়ারা ডাকলেন, কুসুম আয় চুল বাইন্দা দেই। কুসুম এল না। কোন উত্তরও দিল না। তার কিছুক্ষণ পর মনোয়ারা ভেতরের বারান্দায় গিয়ে দেখলেন কুসুমের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। শরীরের খিচুনি হচ্ছে। কুসুম ভাঙ্গা গলায় বলল, মাগো আমারে মাফ কইরা দিও। আমি বিষ খাইছি। ধান খেতে যে বিষ দেয় হেই বিষ।

কুসুমকে নিয়ে নৌকা রওনা হয়েছে। ইঞ্জিনের নৌকা পাওয়া গেল না। বৈঠার ছোট নৌকা। দ্রুত যেতে পারে এই জন্যেই ছোট নৌকা। নৌকা বাইছে মোবারক, সুরুজ এবং মতি। রাজবাড়ির মেয়ের ইঞ্জিনের নৌকাকে যে করেই হোক ধরতে হবে। মতির মন বলছে — একবার কুসুমকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারলে সে কুসুমকে বাঁচিয়ে ফেলবে।

প্রবল জ্বর অগ্রাহ্য করে মতি নৌকা বাইছে। প্রাণপণ শক্তিতে দাড় টানছে সুরুজ আলি। কুসুম মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কি বলার চেষ্টা করছে। তার কথা শোনার কারো সময় নেই।

আকাশজোড়া শ্রাবণের মেঘ। ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মতি এবং সুরুজ মিয়া দু'জনই এতে স্বস্থি পাচ্ছে। কারণ তাদের দু'জনের চোখেই পানি। শ্রাবণ ধারার কারণে এখন আর এই চোখের পানি আলাদা করে চোখে পড়বে না।

নৌকা হাওড়ে পড়ল। বাতাসে বড় বড় ঢেউ উঠছে। নৌকা টালমাটাল করছে — মোবারক শক্ত হাতে হাল ধরে আছে। বৃষ্টি নেমেছে মুষলধারে। জ্বর, পরিশ্রম, আতংক এবং ক্লান্তি সব মিলিয়ে মতির ভেতর এক ধরনের ঘোর তৈরী হয়েছে। তার কেন জানি মনে হচ্ছে অপূর্ব গলায় কেউ একজন কাছেই কোথাও গাইছে —

তুই যদি আমার হইতি, আমি হইতাম তোর।